রবীন্দ্র-চিত্রকলা

রবীন্দ্র-চিত্রকলা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

সরস্বতী লাইব্রেরি
সি ১৮-১৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ
সরস্বতী লাইব্রেরি
সি ১৮-১৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার পরিকল্পিত
বাঙলা লিনোটাইপ হরফে গ্রথিত

মূল্য : ছয় টাকা
১৯৪৯

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আবাল্যসুহৃদ শ্রীহীরালাল দাসগুপ্ত করকমলেষু

আমি চিরদিনের কাঠখোট্টা মানুষ। তোমার ভাবচঞ্চল কল্পনাপ্রবণ কলারসিক মনের সংস্পর্শে ও সংঘাতে আমার অবচেতন মনের গভীরে ভাঙচুরের ভিতর দিয়ে যে নব সৃষ্টির বনিয়াদ গড়ে উঠেছে, তার উৎস থেকেই এই বই লেখার উদ্দীপনা সমুদ্ভূত। আমার লেখা যেমনই হোক, আমি জানি তোমার প্রীতির স্পর্শে তা যোগ্যতার অধিক সম্মান লাভ করবে। তাই নিশ্চিন্ত মনে এই বই তোমার হাতে তুলে দিলাম।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের উৎসাহ এবং সমর্থন না পেলে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হোত না। একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি একে বিশেষত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। এই সহৃদয়তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এবং এ যাবৎ অপ্রকাশিত যে দশখানি নূতন ছবি এই পুস্তিকাকে গৌরবান্বিত করেছে, তার জন্য এবং বাকী ছবিগুলির ব্লকের জন্য শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ—বিশেষ ভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থন বিভাগের সহযোগী কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন এবং রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন আমার ধন্যবাদার্হ। অঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথের ছবিখানার জন্যে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশম্ভু সাহার নিকট আমি ঋণী। পরিশেষে স্মরণ করছি বন্ধুবর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ. গুহরায় ও প্রীতিভাজন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তকে, যাদের প্রভূত আগ্রহ ও যত্নে এই পুস্তিকাখানির মুদ্রণকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ॐ

ভূমিকা

বন্ধুবর মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের আঁকা ছবির উপর 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা' নামে গবেষণাপূর্ণ একটি পুস্তক প্রকাশ করছেন। শিল্পব্যবসায়ী না হয়েও মনোরঞ্জনবাবু কর্তৃক গুরুদেবের আঁকা ছবি বোঝবার ও সাধারণকে বোঝাবার এই প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়। এদেশে এবং বিদেশে শিল্পীরা ও শিল্পসমালোচকরা গুরুদেবের ছবির সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন সত্য, তবু আমাদের দেশের সাধারণ সুধীসমাজের পক্ষ থেকেও বিশদ ও সুচিন্তিত আলোচনার আশা আমরা করি। সুতরাং মনোরঞ্জনবাবুর এই গ্রন্থকে সময়োপযোগীও বলতে হবে।

সাধারণতঃ ছবি ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা করাই এক দুরূহ ব্যাপার, গুরুদেবের ছবির ব্যাখ্যা করা তো অসম্ভব বললেই হয়। সে ছবি কেবল চোখ মেলে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা ছাড়া বোঝবার আর কোনো প্রকৃষ্ট উপায় দেখিনে। কিন্তু, আমাদের সকলেরই ছবি বোঝবার ও বোঝাবার ইচ্ছা আছে এবং নিজ নিজ রসানুভূতি অনুযায়ী আলোচনা করবার অধিকারও আছে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি সম্পর্কে যত বেশি আলোচনা ও সমালোচনা হবে, সাধারণে ততই অভূতপূর্ব আধুনিক এই সৃষ্টি বুঝবেন এবং শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত ও ধন্য করবেন।

পূর্বেই বলেছি, শিল্পসৃষ্টি বিশ্লেষণের জিনিস নয়, বোধের জিনিস। তবুও শিল্পের বিষয়ে যত আলোচনা ও সৎ সমালোচনা হয়, সাধারণের দৃষ্টি তত প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং শিল্প বিষয়ে রসানুভূতি নিবিড় ও রসদৃষ্টি স্বচ্ছ হয়। এরূপ আলোচনা শিল্পসৃষ্টি চিনে নিতে সাহায্য করে।

আদিম যুগ হতে আজ পর্যন্ত যত শিল্পসৃষ্টি হয়েছে ও ভবিষ্যতে হবে, সবারই সৃষ্টির প্রক্রিয়া অভিন্ন। প্রকৃতিতে সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া শিল্পেও তাই। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সৃষ্টি তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। শিল্পী কেবলমাত্র নিজ উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েও ভাগ্যক্রমে কখনও কখনও অহৈতুক আনন্দের সন্ধান পেয়ে যান, তখনই তাঁর সৃষ্টি আনন্দে পূর্ণ হয়ে শিল্পের অমৃতপদবী পায়।

গুরুদেব অলোকসামান্য প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন ও আবাল্য সাধনা

করেছিলেন। সাহিত্যের ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রতিভা শতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কেবল সাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর বিরাট আনন্দানুভূতি ও কবিত্বশক্তি প্রকাশের উপায় হিসাবে যথেষ্ট হয়নি বলেই তিনি শিল্পকলার আরও নানা ক্ষেত্রে নানা উপায় ও উপকরণের আশ্রয় নিতে উন্মুখ হয়েছিলেন। নানা শিল্পকলা অনুশীলন ও অনুধাবন ক'রে নিজ সহজ স্বাভাবিক প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করেছিলেন। সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি কলাবিদ্যা ও ঋতু উৎসব, সামাজিক উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান—এ সবের অনুশীলন, অনুধাবন, ও সুষ্ঠু পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার ক্রিয়ায় ও প্রভাবে ঐসবের প্রভূত সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। আজ বাংলাদেশে উল্লিখিত কলাসকলের চর্চায় যে একটি সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও আভিজাত্যের প্রকাশ প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে গুরুদেবেরই বহুমুখী প্রতিভা ও অনুশীলন। আর, মনে রাখতে হবে, ঐসব সৃষ্টির কাজে, ঐরূপ সাধনায় তাঁর সমস্ত জীবন এবং প্রকৃতি ছন্দোময় ও রসময় হয়ে উঠেছে। ঐরূপে অভিনব কোনো কলা-সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হওয়াও তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। কারণ, রসানুভূতি ও ছন্দোময়তাই সকল কলাসৃষ্টির মূল কারণ, উপায়, উপাদান ও লক্ষ্য বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

আদিম যুগ থেকে যেসব শিল্পসৃষ্টি হয়েছে সকলের মধ্যে একটি মূলগত মিল আছে। শিল্পসৃষ্টির একদিকে আছে ভাব, আর এক দিকে আছে সেটিকে প্রকাশের উপযোগী আঙ্গিক। কিন্তু আধুনিক যুগে ভাব ও আঙ্গিক উভয়ের সম্বন্ধ বা পারম্পর্য নিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা যেন বিপর্যয় দেখা যায়। কিন্তু, সেটা শুধুই দৃশ্যতঃ। পূর্বে ছিল আগে ভাবনা, পরে তার প্রকাশ আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে। এখন কখনও কখনও দেখি, প্রথমে আঙ্গিকের প্রকাশ, পরে তাতে ভাবনার সংযোজন। আসলে, ঐরূপ প্রতিভাবান আধুনিক শিল্পীর অবচেতন মনে ভাবনা লুক্কায়িত থাকে মাত্র এবং গোপনে আঙ্গিককে নিয়ন্ত্রিত করে; অথবা এমনও বলা চলে যে এঁদের কারও কারও সৃষ্টিতে ভাবনা ও আঙ্গিকের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ব্যবধান নেই, উভয়ে মিলে একটি অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই শিল্পসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁরা যা করেন তা আবিষ্ট হয়েই করেন; সৃষ্টি করার কারণ ও আঙ্গিকের প্রয়াস বা পরীক্ষা জাগ্রত মনের কাছে সম্যক্ স্পষ্ট ও পরিস্ফুট নয়, কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে স্থির করা কঠিন। এঁদের মন স্বভাবতঃই ছন্দোময়; এঁদের শিল্পসৃষ্টি যতক্ষণ একটি সুসমঞ্জস আকার ও পূর্ণতা না পাচ্ছে ততক্ষণ এঁদের শিল্পচেষ্টার বিরাম দেখা যায় না। চীনা মনীষী শিল্পীও ব'লে গেছেন শুনতে পাই: প্রেরণাটাই সব, আঙ্গিকটাই সব, উভয়ে কোনো তফাত নেই।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির, রবীন্দ্রনাথের রচিত চিত্রাবলীর ঠিকমতো মর্মবোধ করলে আশা করি উল্লিখিত উক্তি আর হেঁয়ালি ব'লে মনে হবে না।

১৭ মার্চ ১৯৪৯ নন্দলাল বসু

কৈফিয়ৎ

তখন আমি রাজসাহী জেলে বিনা-বিচারে নজরবন্দী—আরো প্রায় ৫০ জন নজরবন্দীর মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নজরবন্দীদের দ্বারা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল, সেখানে আমি রবীন্দ্রনাথের আর্ট সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। তার কয়েক মাস পরে সেই খবর পেয়ে দমদম জেল থেকে আমার একান্ত স্নেহভাজন শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বসু এম. এ. চিঠির মারফত রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু লিখে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানায়। এই বইতে প্রকাশিত লেখাগুলি সেই অনুরোধ রক্ষা করার উপলক্ষেই নূতন করে লেখা হয়েছিল—এগুলি রাজসাহী জেলে পঠিত প্রবন্ধটির প্রতিলিপিমাত্র নয়। পর পর আটখানা চিঠিতে সম্পূর্ণ লেখাটা দমদম জেলে পাঠানো হয়েছিল। চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল পর পর শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বসু ও পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে। এতগুলি চিঠি লিখতে হয়েছিল এইজন্যে যে জেলের নিয়মানুযায়ী কোনো একটা চিঠিতে ৪ পৃষ্ঠার বেশি লেখার উপায় ছিল না। নজরবন্দীদের চিঠিপত্র লেখাও একটা হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল। চিঠি লিখে সব চিঠিই পাঠাতে হোত পুলিশ আফিসের মারফতে। সেখানকার হুজুরদের কবে যে মর্জি হবে চিঠিটা পড়ে পরীক্ষা করে ডাক-বাক্‌সে ফেলে দেবার কিংবা কখনই সে মর্জি হবে কি না, তার কিছুই ঠিক ছিল না। যে-সব চিঠি পাশ করে ডাকে দেওয়া হোত, তারও হয়তো লাইনের পর লাইন কালি-লেপা কিংবা কাঁচিকাটা করে দুরবস্থার একশেষ ঘটিয়ে, তবে ছেড়ে দেওয়া হোত। তাই চিঠি লিখে সে চিঠি পেঁাছোলো কি না কিংবা কি অবস্থায় পেঁাছোলো, তা না জানা পর্যন্ত দ্বিতীয় চিঠি লিখতাম না। এইভাবে সবগুলি চিঠি লিখে দমদম জেলে পাঠিয়ে দিতে সাত মাস সময় লেগেছিল। প্রথম চিঠিখানা লেখা হয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বসুকে ১০।৯।৪৩ তারিখে এবং শেষ চিঠিখানা শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ১২।৪।৪৪ তারিখে। সুখের বিষয়, প্রায় সবগুলি চিঠিই শেষ পর্যন্ত যথাস্থানে অক্ষত দেহেই পেঁাছেছিল। কেবল শেষ চিঠিটা কোথায় গিয়ে যে পথ হারালো,

তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন প্রায় দু'মাস ধরে আমাদের সব চিঠি পুলিশ আফিসে গিয়ে জমা হয়ে থাকতো—কোনো চিঠিই পাশ করা হোত না। যে কর্মচারীটি বিশেষভাবে এই কাজের জন্যে নিযুক্ত ছিল, সে না থাকায় এবং তার জায়গায় অন্য কেউ নিযুক্ত না হওয়ায়, এই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে সবগুলি চিঠিই যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ-আফিস খবর দিয়েছিল বটে। কিন্তু অন্য কোনো চিঠির কথা জানিনে, আমার চিঠিটা যে যথাস্থানে পেঁছায়নি, সে খবর পেয়েছিলাম আরো অনেকদিন পরে। তারপরে অনেক লেখালেখি করেও যখন আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন ২৬।৮।৪৪ তারিখে আর একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম। এবারে আর কোনো গোলযোগ ঘটেনি—চিঠিটা যথাসময়ে যথাস্থানে পেঁছে আমার হারিয়ে-যাওয়া চিঠিটার শূন্যস্থান পূর্ণ করলো।

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এ লেখাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করতে পারিনি। যা লিখেছি, তা প্রকাশযোগ্য হয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিখ্যাত শিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত নন্দলাল বসু মহাশয়কে দেখিয়ে তাঁর অভিমত জেনে নেওয়ার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। কিন্তু এতদিন তার সময় করে উঠতে পারিনি। ১৯।২।৪৭ তারিখে হঠাৎ শান্তিনিকেতন যাওয়া স্থির করে ফেললাম এবং সেইদিনই রাত্রে জেলের বন্ধু স্নেহভাজন শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের শান্তিনিকেতনস্থ বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলাম ও তাকে সঙ্গে করে নিয়ে নন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। পরের দিন সকালে লেখাটা নন্দবাবুকে পড়ে শোনানো হোল। শুনে তিনি না জানি কি অভিমতই দেবেন—ভালই বলবেন, কি মন্দই বলবেন—এই ভেবে আমার মনে খুব একটা আশঙ্কা জেগে ছিল। তিনি চুপ করে সবটা শুনে গেলেন। কিন্তু পড়া শেষ হয়ে গেলে তিনি যে-সব কথা বললেন, তাতে আমার সব আশঙ্কা কেটে গিয়ে মনটা খুশিতে ভরে গেল।

চিঠিতে যা লেখা হয়েছিল, এই বইতে তার সবটাই যে হুবহু একই রয়ে গেছে, তা নয়। নন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে কিছু কিছু সংশোধন করতে হয়েছে। কিছু কিছু নূতন মাল-মসলা হাতের কাছে পেয়ে, তা-ও যথাস্থানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কিছু রদ-বদল ও স্থানে স্থানে ভাষার কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এইসব কারণে লেখাগুলি চিঠির আকারে না রেখে বিষয় অনুসারে বিভিন্ন নামের অনুচ্ছেদে ভাগ করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। অন্যের মতামতের অপেক্ষা না করে, আমার নিজের যতটুকু রসানুভূতির ক্ষমতা আছে, তা থেকেই আমি এ কথা বলতে পারি। কিন্তু কেন শ্রেষ্ঠ এবং বৈশিষ্ট্যটা কি, সে সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, তা শুধু নিজের মতের উপর নির্ভর করে অপরের কাছে জাহির করা সমীচীন হবে না। কেননা, আমি এ বিষয়ে এমন কোনো বিশেষজ্ঞ নই যে আমি বললেই লোকে আমার কথা বেদবাক্যের মতো মেনে নেবে। তাই লেখায় উদ্ধৃত অংশের পরিমাণ বেশি হবে, একথা আগে থেকেই বলে রাখা ভাল। তারপরে, কলার রসগ্রহণ এক কথা, তা অন্যকে বোঝানো সম্পূর্ণ আলাদা কথা। একটা হচ্ছে অন্তরের নিগূঢ় অনুভূতির ব্যাপার, অপরটা মস্তিষ্কের অনুশীলন, বিদ্যার প্রাচুর্য ও জ্ঞানের পরিপক্কতা সাপেক্ষ। তার উপরে মুশকিল এই যে রবীন্দ্রনাথ একেবারে অত্যাধুনিক আর্টিস্ট। শুধু তা-ই নয়—তিনি ভবিষ্যৎ কালের আর্টিস্ট। তাঁর আর্টের টেকনিক, ডিজাইন ও বিষয়বস্তু—সবই সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এবং একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। অজন্তা, মুঘল, রাজপুত, কাংড়া প্রভৃতি ভারতীয় চিত্রকলার যে-সব ধারা সকলের জানা, তার কোনোটার সঙ্গেই এর কোনো মিল বা সাদৃশ্য নেই; ইউরোপীয় চিত্রকলার যে-কোনো ধারা থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। রবীন্দ্র-চিত্রকলা কলা-জগতের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"It was unique. His art was his very own. One cannot imitate it, nor can one explain it to one's satisfaction. Neither can the critic fit it into a set theory of his own or bring it under a distinct category."—*Visva-Bharati Quarterly,* May-Oct. 1942

রবীন্দ্র-চিত্রকলা কলাজগতের অভিনব সৃষ্টি—অনন্যসাধারণ। তাঁর চিত্রকলা একান্তরূপে তাঁর নিজস্ব—তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। এ চিত্রকলার হুবহু অনুকরণ কারো পক্ষেই যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি মনের মতো করে সমুচিত ব্যাখ্যা দেওয়াও অসম্ভব। কোনো কলা-সমালোচক যে একে কোনো বিশিষ্ট

কলারীতির অন্তর্ভুক্ত বলে দেখাবেন, কিংবা তাঁর নিজস্ব কোনো ধরা-বাঁধা তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে এর ব্যাখ্যা দেবেন, তারও কোনো সম্ভাবনা নেই।—বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, মে-অক্টোবর ১৯৪২

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী লিখেছেন: "প্যারিসে যখন তাঁর প্রথম এক্‌জিবিশান হোল, তাঁর মুখেই শুনলুম, পল্‌ ভেলেরি এবং আঁদ্রে জিদ্‌ ছবি দেখে বলেছিলেন, 'ডাঃ টাগোর, আমরা এখন সবেমাত্র যা ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দেশের এই সব বিচিত্র আর্ট আন্দোলনের তলায় তলায় যে নূতনকে পাবার চেষ্টা লুকানো রয়েছে, আপনি কী করে এত সহজে সেই জিনিসকে চোখের সামনে এনে ধরলেন? আপনার এই অত্যাশ্চর্য কীর্তি যে কত বড়ো, তা হয়তো এখন সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না—সংস্কৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে মানুষের চিন্তাশক্তি যতই বিকশিত হবে, এই চিত্রগুলির কথা ততই তারা বুঝতে পারবে।'"—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

এই কথাগুলির তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারবো এবং চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধেও আমরা একটা ধারণা করতে পারবো, যদি আমরা জানি, পল্‌ ভেলেরি ও আঁদ্রে জিদ কথিত এই যে আধুনিক আর্ট আন্দোলন, তার ভিতরকার সমস্যাটা কি? কেননা, তাঁদের মতে রবীন্দ্র-চিত্রকলায় সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত চীনা লেখক লিন্‌-ইউ-তাং বলেন :

"They are the revolt (which modern western painting is going through) against the subjection of the artist's lines to the painted objects, and the revolt against a photographic reproduction of material reality." . . .

"Modern art is in search of rhythms and experimenting on new forms of structure and pattern. It has not found them yet. It has succeeded only in giving us the impression of trying to escape from reality. Its most apparent characteristic is the effort, not to soothe us but jar on our senses."
—Lin yu-tang, *My Country and My People*

ইউরোপের আধুনিক আর্ট-আন্দোলনের গোড়ার কথাটাই হচ্ছে গতানুগতিক চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে এবং বাস্তবের হুবহু অনুকরণের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। আধুনিক চিত্রকলা নব নব ছন্দের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত এবং নব নব রূপসৃষ্টির পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। সে অনুসন্ধানের—সে পরীক্ষার এখনো শেষ হয়নি। যতটা

হয়েছে, তার ফলে আমাদের মনে শুধু এই ধারণা জন্মেছে যে এই অনুসন্ধানটা বাস্তবের প্রভাব থেকে পলায়নের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে চেষ্টার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে, তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করে না, বরঞ্চ উৎকট পীড়ার কারণ হয়।—লিন্ ইউ-তাং, "আমার দেশ ও আমার জাতি"

এই উদ্ধৃত কথাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সমস্যাটা হচ্ছে, চোখে যা দেখছি, তার অন্ধ অনুকরণ-রীতির দাসত্ব কাটিয়ে নব নব ছন্দ ও নব নব রূপসৃষ্টির সমস্যা। পল্ ভেলেরি ও আঁদ্রে জিদের মতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় সে সমস্যার সমাধানের পথ দেখানো হয়েছে। তাই তাঁরা বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের আর্ট ভবিষ্যৎ কালের—এই যুগের সাধারণ মানুষ হয়তো তা বুঝবে না—বুঝবে ভবিষ্যতের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ আর্টে নূতন ধারার সৃষ্টিকর্তা। সে ধারা এখনো দুকূলপ্লাবী প্রবাহরূপে দেখা দেয়নি। সবেমাত্র সে তার উৎসের পাষাণ-কারা ভেদ করে বাইরে এসে পৌঁছেছে। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতের মানুষ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু বিচিত্র সৃষ্টির উপঢৌকনে সে ধারাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত করে তুলবে। তখন তার আকার, প্রকার ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কারো মনেই কোনো সন্দেহ থাকবে না। তখন এ চিত্রকলার রসগ্রহণ সকলের পক্ষেই সহজ হবে। কিন্তু এখন এই একান্ত অভিনব অনভ্যস্ত চিত্রকলা সাধারণের গ্রহণীয় বিবেচিত না হওয়া আশ্চর্যের কথা নয়।

এ হেন যে কলাসৃষ্টি, যাকে অবনীন্দ্রনাথের মতো আর্টিস্ট বলেছেন 'অনন্যসাধারণ' এবং পল্ ভেলেরি ও আঁদ্রে জিদের মতো কলাবিশেষজ্ঞ বলেছেন 'আগামী যুগের আর্ট', সে সম্বন্ধে আমার মতো অনভিজ্ঞ লোকের কিছু লিখতে যাওয়া একটা দুঃসাহস বলে' বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নয়। আমার মনেও যথেষ্ট সঙ্কোচ জেগে রয়েছে এই ভেবে যে ভুল বুঝে কোনো ভুল কথা লিখে না বসি। তবু যে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি, তা এই ভেবে যে এই লেখা পড়ে যদি পাঠকদের এ সম্বন্ধে আরো জানবার আগ্রহ বাড়ে, তবে তাঁরা নিজেরাই একদিন আমার ভুলের সংশোধন করে নিতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথের কলাচর্চা

একটা কথা আছে, "Great art is an unconscious creation."—উঁচু দরের কলাসৃষ্টিকে বলা যায় অপ্রবুদ্ধ সৃষ্টি অর্থাৎ স্রষ্টার অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্টিতে অনন্যসাধারণ মনোহারিত্ব প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে,—সে সৃষ্টির কতটা যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি, তা সে নিজে বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও রেখা নিয়ে খেলতে খেলতে কখন যে চারুকলার রাজ্যে পৌঁছে গেছেন, তা প্রথমে তিনি নিজেও জানতে পারেননি। তিনি নিজের খাতায় কবিতা লিখতেন এবং সংশোধনের সময়ে স্বভাবতই নানা কাট-কুট করে সংশোধন করতেন। কিন্তু খাতার এই কাটকুটগুলি তাঁর চোখে নিতান্ত কুৎসিত ঠেকতো। তাঁর কলারসিক মনের পক্ষে এই সব কুৎসিত দৃশ্যের বিকট ভেংচি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল বলেই তিনি এক সময়ে প্রতিকার মানসে সেই কাটকুটের উপর দিয়ে কলম চালাতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সেই খাতার পাতায় লেখা হস্তাক্ষর ও সেই হস্তাক্ষরের পংক্তির পর পংক্তি এবং তার সঙ্গে কাটকুটের উপর কলম চালিয়ে তিনি যে হিজিবিজির নকসা এঁকে তুলতেন, সবটা মিলে যে পর্যন্ত না তাঁর আপন চোখে প্রীতিপ্রদ একটা রূপ ফুটে উঠতো, সে পর্যন্ত তাঁর কলম থামতো না। এই কাজ করতে করতে এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছে, এই যে কুৎসিতকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার চেষ্টা—এই যে এলোমেলো কাটকুটের রূপান্তর সাধন করে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সম্পূর্ণতায় তাকে গড়ে তোলা,—এর নামই তো কলাসৃষ্টি। একাজ করতে গিয়ে তাঁর কলমের মুখে রেখার কত যে রকম-রকমের অপূর্ব ভঙ্গি, কত যে বিচিত্র ছন্দ ফুটে উঠেছে, এসব কলাসৃষ্টি নয় তো কি? একাজ করতে তিনি কত আনন্দ পেতেন—সব কাজ ফেলে রেখে কত সময় ও শ্রম এর পেছনে ব্যয় করতেন। চারুকলা তো অন্তরের আনন্দ-সাগরের হিল্লোল, যা বাইরে রূপায়িত হয়ে অপরের মনেও অনুরূপ আনন্দের দোলা জাগিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের এ সৃষ্টিও তো আনন্দের সৃষ্টি, এ-ই বা কলাসৃষ্টি বলে গণ্য হবে না কেন?

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী লিখেছেন: "বোধ হয় ১৯২৭-এ তিনি তুলির কাজ বা কলমের মুখ দিয়ে রেখাঙ্কন শুরু করেন। বহুকাল পরে পাণ্ডুলিপির

খাতায় লেখা-কাটার ছলে এই আঁকাজোঁকার কাজে মন দেন। তাঁর লেখা-কাটার পদ্ধতি একটি নতুন নক্‌সার আলপনা তৈরি করে তুলত, এই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। এই রকম অনেকদিন ধরে লেখার সঙ্গে আঁকার খেলা মিলিয়ে খাতার পর খাতা ভরে গান কবিতা লিখেছেন। এই উদ্দেশ্যহীন আঁকার সময় তাঁর মন ডানা ছড়িয়ে অবাধে কল্পনালোকে ঘুরতে পারত; তাই লেখার মাঝে ফাঁকা সময়টুকু তাঁর চিত্তকে চিন্তা করবার অবকাশ দিত। তিনি সেই শূন্য সময়টা পূর্ণ করতেন রেখাঙ্কনের অবলীলায়মান খেলায়। সেই তাঁর মনোলোকের 'আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম্‌' ভাবগুলো ভাষায় যেমন বিশেষ আকৃতি নিয়ে বাঁধা পড়ত, রেখায় থাকত তেমনি জল্পনা-কল্পনার অনির্দিষ্ট সঙ্কেত। অর্থাৎ রেখায় পড়ত ধরা সৃষ্টির প্রাক্কাল। আর ভাষায় দেখা যেত ভাবের পরিপূর্ণ রূপ। বস্তুত এমনি করেই তাঁর লেখা-কাটাকুটির খেলা একদিন চিত্রজগতের দ্বারে এসে ঘা দিল।"—বিশ্বভারতী পত্রিকা—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

নিজের এই সৃষ্টির প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা গভীর মমত্ব-বোধ ছিল। তিনি বলতেন: "ছবি হোল আমার শেষ বয়সের প্রিয়া, তাই নেশার মতো আমাকে পেয়ে বসেছে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্কোচের অবধি ছিল না। নিজের আর্ট যে কি দরের আর্ট—ললিতকলার জগতে তাঁর স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। অনেক সময় তিনি বলতেন: "লিখতে পারি তা আমি জানি, সেখানে আমার নিজের লেখার শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে; কিন্তু আঁকা সম্বন্ধে আজও আমার সঙ্কোচ যায় না। আমি তো নন্দলাল অবনের মতো আঁকতে শিখিনি, তাই অনেক সময় মনে হয়, ওটা আমার পথ নয়।" ১৯৩০ সালে ১২৫ খানা ছবি নিয়ে প্যারিসে যখন তাঁর প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়, তার পরে তিনি প্রতিমা দেবীকে সেখান থেকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "বস্তুত আজকাল আমার লেখার স্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই, ছবি আঁকি—যারা সমজদার তারা বলে, এই হাল আমলের ছবিগুলো সেরা দরের। একটু একটু করে বুঝতে পারছি, এরা কাকে বলে ভালো, কেন বলে ভালো। তুমি যে একদা বলেছিলে, আমার ছবিগুলো ভালো জাতের, সে কথাটার পরখ হয়ে গেল, এরাও তাই বলচে। শুনে আশ্চর্য ঠেকচে।"

এই সব কথাবার্তা থেকেও বোঝা যায় যে নিজের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অন্যের কাছে শুনে শুনে তাঁর মনে একটা বিশ্বাসের আভাস জাগলেও, সৃষ্টির কালে তিনি কিছুই বুঝতে পারতেন না। সৃষ্টির প্রেরণায় মনের আনন্দে তিনি এঁকে যেতেন—

ভালো হোল, কি মন্দ হোল, সে বিষয়ে তাঁর খেয়াল থাকতো না। তা না হোলে কি আর উঁচু দরের আর্ট হয়! উঁচু দরের চিত্র আঁকবো—এই মতলব করে আঁকতে বসে কেউ বড় দরের আর্ট সৃষ্টি করতে পারে না। মেপেজুখে হিসেব করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গায়ের খাটুনি খাটলে ভালো মিস্ত্রির কারিগরি দেখানো যেতে পারে। কিন্তু শুধু তাতেই কলাসৃষ্টি হয় না। তা যদি হোত, তাহলে এত দিনে আরো বহু তাজমহল তৈরি হয়ে যেতো। যে আশ্চর্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টি এই তাজমহল, এ সৃষ্টি হঠাৎই এমনটা হয়েছে,—স্রষ্টা নিজেও তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি যে কি অপূর্ব সৃষ্টি তিনি গড়ে তুলছেন। সে সৃষ্টি শেষে এমন সৃষ্টিই হয়েছে যা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। যা হয়েছে তার এক চুল এদিক-ওদিক হোলেই, কলার ধ্বংস অনিবার্য। সব উঁচু দরের সৃষ্টি সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। বড়ো সৃষ্টির অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয়।

কাব্যকলা ও চিত্রকলা

রবীন্দ্রনাথ কাটকুটের সংশোধনের ধাপ পেরিয়ে যখন চিত্র আঁকতে আরম্ভ করলেন, তখন এমন এক প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁকে পেয়ে বসলো যে তিনি প্রায় দিনরাত এই কাজ নিয়েই থাকতেন। তিনি নিজে একজন খুব বড়ো কবি ও অভিনেতা। সাত বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে সারা জীবন ধরে অসংখ্য কবিতা ও গান লিখেছেন। কবি সুসঙ্গত শব্দের সমাবেশে যা সৃষ্টি করে তোলেন, কিছুটা শিক্ষা ও অভ্যাস থাকলে রেখার সাহায্যে কিংবা আলোছায়ার সমাবেশেও তা এঁকে তুলতে পারেন। অন্তরে অন্তরে কবিও আর্টিস্ট, আর্টিস্টও কবি এবং এই কথাই ঠিক কথা যে, শব্দ দিয়ে কবি চিত্রই এঁকে তোলেন—মানস চক্ষে যে চিত্র তিনি দেখেন, তাকেই কবিতায় রূপ দেন। বিখ্যাত চৈনিক লেখক লিন্ ইউ-তাং লিখেছেন :

"Poetry and painting come from the same human spirit, and it is natural that the spirit and the inner technique of both should be the same. .... the painter shows the same impression, the same method of suggestion, the same emphasis on an indefinable atmosphere and the same pantheistic union with nature, which characterise Chinese poetry. For the poetic mood and the picturesque moment are often the same, and the artist mind which can seize the one and give it form in poetry, can also, with a little

cultivation, express the other in painting."—Lin yu-tang, *My Country and My People*

কবিতা ও চিত্রকলা মানুষের আন্তর প্রকৃতির একই উৎস থেকে উৎসারিত। তাই স্বভাবতই উভয় প্রকার কলাসৃষ্টির প্রকৃতিগত ও পদ্ধতিগত মৌলিক মিল থাকা অনিবার্য। তাই দেখা যায়, চৈনিক কবিতার যা বিশেষত্ব, চৈনিক চিত্রকলারও তা-ই। মনের সংস্কার, ভাব প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত সঙ্কেতের পদ্ধতি, অনির্বচনীয় নিগূঢ় ভাবের আবহাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপলব্ধি এবং প্রকৃতির সঙ্গে আপন ঐশ্বরিক অংশ-সম্ভূত চেতনশীল অন্তঃপ্রকৃতির একাত্মতাবোধ—এই সব বিষয়ে কবি ও চিত্রকরের কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, কবিত্বের ভাব ও চিত্রাঙ্কনের প্রেরণা মূলত একই বস্তু। যে কলারসিক কবিত্বের ভাবে ভাবিত হয়ে সে ভাবটাকে কবিতায় রূপ দিতে পারেন, চিত্রাঙ্কনের আঙ্গিকে খানিকটা দখল থাকলে তাঁর পক্ষে চিত্রকলায়ও সে ভাবটাকে রূপ দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভবপর।—লিন্ ইউ-তাং, "আমার দেশ ও আমার জাতি"

সমস্ত জীবন ধরে কবিতা লেখার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনের ভাণ্ডার অসংখ্য চিত্রের সমাবেশে বোঝাই হয়ে উঠেছিল। শুধু গদ্য-পদ্যের স্রোতোধারায় কথার পুষ্পাঞ্জলি ঢেলে তিনি সে ভাণ্ডার নিঃশেষে উজাড় করে দিতে পারেননি। সে উৎস-ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ সঞ্চয় বহন করা রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই সুপরিসর স্রোতোধারার পক্ষেও সম্ভবপর হয়নি। তাই লেখার কাটকুটের উপরে কলম চালিয়ে চালিয়ে যখন রেখা অঙ্কনে হাত পেকে উঠলো, তখন তাঁর কলমের মুখে বা তুলির অগ্রে মনের বোঝাই করা ভাণ্ডার থেকে চিত্রসৃষ্টির ঢল নেমে এলো। অবনীন্দ্রনাথ বলেন :

"His art had something volcanic about it. It came out like a volcanic eruption—all that had been accumulated in the past and its very impetus gave it form, its very force shaped its course . . . Pause for a moment to contemplate the immensity of his genius. Literature, poetry and music were not enough for its full play, but it must perforce find an outlet through line and form and colour, in his old age, in order fully to realize itself. He was like a volcano nursing in his bosom the accumulated fire of countless ages till he could contain it no longer and allowed it to burst forth flooding the surroundings with molten art-forms, as it were, and it was not till then that his urge for expression fulfilled itself. It is not for every one to

comprehend the process. It is not easy to gather fire from the bosom of the volcano without an all-compelling urge and an all-consuming desire."
—Visva-Bharati Quarterly, Abanindra Number, 1942

অর্থাৎ, তাঁর চিত্রকলার সৃষ্টি আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তুলনীয়। আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাসের মতোই তাঁর তুলি বা কলমের মুখে বেরিয়ে আসছিল অজস্র ধারে, যা সমস্ত জীবন ধরে তাঁর ভিতরে জমে উঠেছিল। তাঁকে চেষ্টা করে রূপ সৃষ্টি করতে হয়নি। নিজের অন্তরের পুঞ্জীভূত বোঝাটাকে খালাস করে দেবার যে বিপুল আবেগ তাঁর মনে এসেছিল, সেই আবেগ নিজে নিজেই তাঁর প্রকাশের রূপ ও উপায় ঠিক করে নিয়েছিল।......ভেবে দেখো কী বিপুল তাঁর প্রতিভা! গদ্যে পদ্যে গানে অশেষ প্রকারে আপনাকে প্রকাশ করেও তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারলো না। তাই তার জন্যে শেষ বয়সে তাঁকে আবার রঙ ও রেখার সহায়তা গ্রহণ করতে হোল। আগ্নেয়গিরির মতোই তিনিও যেন তাঁর বুকে একটু একটু করে অসংখ্য যুগের আগুন জমিয়ে তুলছিলেন। জমতে জমতে একদিন সে আগুন এমন ভাবেই ফেটে পড়লো যে আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত গলিত দ্রব্যের বিপুল উৎসের মতোই তাঁর কলাসৃষ্টি অজস্রতায় চারদিক ভরিয়ে দিয়ে, তবে তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা পূর্ণ পরি-তৃপ্তি লাভ করলো। এই সৃষ্টিধারার স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। একটা অতিশয় প্রবল আগ্রহ ও সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কারো পক্ষেই আগ্নেয়গিরির বুকের আগুন থেকে আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নেওয়া সহজ কথা নয়।—বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, অবনীন্দ্র সংখ্যা, ১৯৪২

এ সম্বন্ধে প্রতিমা দেবী যা বলেছেন, তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: "তিনি যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন, সে যেন বন্যার মতো তাঁর তুলির টানে বেরিয়ে আসত রূপের রেখা। চার পাঁচ খানা ছবি তিনি অনেক সময় দৈনিক শেষ করতেন, তবু যেন তাঁর তৃপ্তি হোত না। সৃষ্টির প্রেরণায় হাতের কাছে যা পেতেন—যেমন ভাঙা কলম বা পেনসিল, যা' তা' কাগজের টুকরো—তাই দিয়েই হাত চলত। ভালো রঙের ধারও ধারতেন না, নানাপ্রকার জিনিস নিয়ে চলত তাঁর আঁকা; অবশ্য পেলিকেন কালিই বেশির ভাগ ব্যবহার করতেন। আঁকার পদ্ধতি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজের—স্বদেশী বা বিদেশী কোনো প্রকার প্রণালীই অনুসরণ করেননি।"—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

বিখ্যাত চীনা চিত্রকর মি ফেই সম্বন্ধে লিন্ ইউ-তাং যা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা চলে:

"Mi Fei, one of the greatest of scholar-painters, sometimes used even a roll of paper for his brush or the pulp of sugar-cane, or the stalk of a lotus flower when the inspiration came and there was magic in the scholar's 'wrist', there was nothing which seemed impossible to these artists. For they had mastered the art of conveying fundamental rhythms, and everything else was secondary. . . . Painting was and still is the scholar's recreation."—Lin yu-tang, *My Country and My People*

অর্থাৎ, কবি-চিত্রকর বলে যাঁদের খুব নাম, মি ফেই ছিলেন সেই সব শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের অন্যতম। যখন প্রেরণা আসত, তিনি তখন তুলির বদলে কখনো কাগজ পাকিয়ে নিয়ে তা দিয়েই ছবি আঁকতেন, কখনো বা পদ্মের মৃণাল, অথবা ইক্ষুদণ্ডের রসহীন ভিতরের অংশটাকে অর্থাৎ ছিবড়েটাকে তুলি হিসাবে ব্যবহার করতেন। এই সব কবি-চিত্রকরদের হাতে যেন ভেলকি খেলতো। মনে হয় যেন এদের অসাধ্য কোনো কাজ ছিল না। আসল কথা হচ্ছে, প্রকৃতির মূল ছন্দ রঙে ও রেখায় ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং চিত্রে ছন্দই হচ্ছে মুখ্য, আর সবই গৌণ। ছবি আঁকা পূর্বকালেও ছিল কবিদের বিশ্রামকালীন আনন্দের খেলা এবং এখনো তা-ই।—লিন্ ইউ-তাং, "আমার দেশ ও আমার জাতি"

এই চীনা চিত্রকর মি ফেই-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। তাঁর মতোই রবীন্দ্রনাথও একাধারে কবি ও চিত্রকর। তাঁর সৃষ্টি যেমন অবসরকালীন আনন্দের খেলা, প্রারম্ভে অন্তত রবীন্দ্রনাথেরও তাই ছিল। তিনি যেমন প্রথমে ক্যালিগ্রাফিতে (অক্ষর-লিখন-শিল্পকলা) হাত পাকিয়ে, তারপরে বাহুল্য সৃষ্টির খেলা হিসেবে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি হাতের লেখার কাট-কুটের উপরে কলম চালাতে গিয়ে রেখা নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ ছবিসৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর মতোই রবীন্দ্রনাথ যেমন কাব্য-সৃষ্টিতে, তেমনি চিত্রকলা-সৃষ্টিতেও অতুলনীয় কৃতিত্ব অর্জন করে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন। তাঁর চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য যেমন রেখা ও রূপের ছন্দ, রবীন্দ্রনাথেরও তা-ই।

অনেকে বলেন, কবে আবার রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শিখলেন! কোনো চেষ্টা না করে হঠাৎ একদিনেই শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হয়ে ওঠা যায়? হয়েছে কেউ কখনো?—ইত্যাদি। বহু দিনের সযত্ন শিক্ষা ও বহু আয়াসসাধ্য পরিপক্ক অভ্যাস ছাড়া কোনো একটা ভাবকে বা ছন্দের রহস্যকে রঙে রেখায় সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ করে কেউ বড় আর্টিস্ট হয়ে উঠতে পারে না—এ কথা খুবই সত্য। রবীন্দ্রনাথও তা হননি—এই কথাটাই

জানা প্রয়োজন। বহু দিন ধরে লেখার কাটকুটের উপরে কলম চালিয়ে তিনি হাত পাকিয়েছেন এবং এইভাবে নিজের চেষ্টায় নিজের পন্থায় রেখা-অঙ্কনের পরিপূর্ণ শিক্ষালাভ করেছেন। কাজেই হঠাৎ একদিনেই তিনি পাকা আর্টিস্ট হয়ে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠেননি। তাঁকেও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনেক চেষ্টা-যত্ন করে এ বিদ্যা অর্জন করতে হয়েছে। অনেকে এ কথা জানেন না বলেই তাঁর কৃতিত্বে অবিশ্বাস করেন। তা ছাড়া, তরুণ বয়স থেকেই তিনি এ বিষয়ের কিছু কিছু চর্চা করে এসেছেন। তাঁর "জীবনস্মৃতি" ও বিভিন্ন লোকের কাছে লেখা চিঠির অংশবিশেষ থেকে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখানে খানিকটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"মনে পড়ে, দুপুর বেলায় (১৮৮৫?) জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা, তাহা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা।"—জীবনস্মৃতি

"মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাত-ছাড়া করতে চায় না, আমারও কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে।...লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে, তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ—তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে, তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।"—ইন্দিরা দেবীকে লিখিত চিঠি, ৩০ আষাঢ় ১৩০০

"শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্য তৈরি করচিনে এবং কোনো দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন, এ রকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না, সেইটের উপর অন্তরের টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেব, তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এ সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেনসিল চালাচ্ছি, তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্ছে; সুতরাং এই রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে—অতএব মৃত র‍্যাফেল তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর যশের

কোনো লাঘব হবে না।"—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত চিঠি, ১লা আশ্বিন ১৩০৭

"আমার এখনকার সর্বপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আঁকা। রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনো কালে যে কবিতা লিখতুম, সে কথা ভুলে গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে, তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে, তেমনি করে কাব্যের ঝরণা কলমের তট রচনা করে ছন্দ প্রবাহিত হোতে থাকে। আমি যে-সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি, তাতে ঠিক তার উলটো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে, ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হতুম, তাহলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস বাইরে খাড়া হোত—তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের বহির্বর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন বেশি নেশা। ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত দরজার বাইরে এসে উঁকি মেরে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। যদি সেকালের মতো কর্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতুম, তাহলে পদ্মার তীরে বসে কালের সোনার তরীর জন্যে কেবলি ছবির ফসল ফলাতুম। এখন নানা দাবির ভিড় ঠেলেঠুলে ওর জন্যে অল্পই একটু জায়গা করতে পারি। তাতে মন সন্তুষ্ট হয় না। ও চাচ্ছে আকাশের প্রায় সমস্তটাই, আমরো দিতে আগ্রহ, কিন্তু গ্রহদের চক্রান্তে নানা বাধা এসে জোটে—জগতের হিতসাধন তার মধ্যে সর্বপ্রধান।"—শ্রীরাণী মহলানবিশকে লিখিত চিঠি, ২১ কার্ত্তিক ১৩৩৫

"আমার বয়স সত্তর হয়ে এল। আজ ত্রিশ বছর ধরে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করেচি, আজ হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ভিৎ পাকা হবে। ছবি কোনো দিন আঁকিনি, আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হুহু করে এঁকে ফেললুম, আর এখানকার ওস্তাদরা বাহবা দিলে। বিক্রিও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর মানে কি? জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল, তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন।"—শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত চিঠি, ১৯৩০

রেখা ও রূপের ছন্দ

আগে বলেছি যে, চীনা চিত্রকর মি ফেই-এর চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য যেমন রেখা ও রূপের ছন্দ (rhythms of line and structure), রবীন্দ্রনাথেরও তা-ই। এই জন্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার রস গ্রহণ করতে হোলে চিত্রকলার রেখা ও রূপের ছন্দ বলতে কি বুঝায়, তা জানা দরকার। কেননা, এইটেই তাঁর চিত্রকলার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। তিনি নিজেও নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই কথাই বলেছেন প্যারিসে তাঁর চিত্রের সর্বপ্রথম প্রদর্শনী উপলক্ষে। তখন সাধারণ্যে প্রচারের জন্যে তাঁর চিত্রের যে পরিচয়-পত্র বেরিয়েছিল, তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তা একটু দীর্ঘ হোলেও এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

"An apology is due from me for my intrusion into the world of pictures and thus offering a perfect instance to the saying that those who do not know that they know not, are apt to be rash where angels are limidly careful. I, as an artist, cannot claim any merit for my courage ; for it is the unconscious courage of the unsophisticated, like that of one who walks in dream on perilous path, who is saved only because he is blind to the risk.

The only training which I had from my young days, was the training in rhythm, the rhythm in thought, the rhythm in sound. I had come to know that rhythm gives reality to that which is desultory, which is insignificant in itself. And therefore, when the scratches in my manuscript cried, like sinners, for salvation and assailed my eyes with the ugliness of their irrelevance, I often took more time in rescuing them into a merciful finality of rhythm than in carrying on what was my obvious task.

In the process of this salvage work I came to discover one fact, that in the universe of forms there is a perpetual activity of natural selection in lines, and only the fittest survives which has in itself the fitness of cadence,

and I felt that to solve the unemployment problem of the homeless heterogeneous into an inter-related balance of fulfilment, is creation itself.

My pictures are my versification in lines. If by chance they are entitled to claim recognition, it must be primarily for some rhythmic significance of form which is ultimate, and not for any interpretation of an idea or representation of a fact."—Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, 1941

একটা কথা আছে, দেবতারা যেখানে ভয়ে ভয়ে সাবধানে পা ফেলেন, যারা নিজেদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অচেতন, তারাই শুধু এরূপ ক্ষেত্রে বেপরোয়া হোতে পারে। আমিও কেন যে চিত্রজগতে অনধিকার প্রবেশ করে সেই বেপরোয়াদের দলেই নাম লেখালুম, তার একটা কৈফিয়ৎ আমার দিক থেকে দেওয়া কর্তব্য। চিত্রশিল্পী হিসেবে এই সাহসের জন্যে আমার কোনো কৃতিত্বের দাবি থাকতে পারে না। এরূপ সাহস হচ্ছে অনভিজ্ঞের অজ্ঞতাপ্রসূত সাহস। যেমন কোনো স্বপ্নচালিত মানুষ বিপদের রাস্তায় চলেও রক্ষা পায় শুধু এই জন্যে যে বিপদের সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নেই, আমার পক্ষেও তাই। ছেলেবেলা থেকে যে একমাত্র শিক্ষা আমি পেয়েছি, তা হচ্ছে—চিন্তা ও সুরের যে ছন্দ, সেই ছন্দের শিক্ষা। তা থেকে আমি এই কথাটা বুঝেছিলাম যে, যা এলোমেলো—যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তার ভিতরে একটা পরিপাটি ছন্দ আনতে পারলেই তবে তার একটা বাস্তব মূল্য হয়—তার বেঁচে থাকবার অধিকার জন্মে। আমার হাতের লেখার কাটকুটগুলির সামঞ্জস্যহীন কুৎসিত রূপ আমার চোখে পীড়া দিত এবং আমার মনে হোত যেন পাপীদের মতোই তারা মুক্তির জন্যে চিৎকার করছে। তাই প্রায়ই আমি আমার আসল কাজ ফেলে রেখে, দয়াপরবশ হয়ে এদের নিয়ে বসতাম এবং একটা ছন্দশীল রূপের সমগ্রতায় নিয়ে গিয়ে এদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করতাম। এইভাবে এদের পেছনে বহু সময় ব্যয় করেছি।

এই কাজ করতে করতে আমি একটা সত্য আবিষ্কার করেছি : এই যে অসংখ্য রূপের জগৎ, এখানে অনবরত রেখার ও রেখাঙ্কিত রূপের একটা স্বাভাবিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন চলেছে; যে সব রূপে ও রেখায় একটা সুষ্ঠু ছন্দের প্রবাহ বর্তমান, তারই শুধু এখানে বাঁচবার অধিকার আছে। এবং আমি উপলব্ধি করেছি যে আশ্রয়হীন বিসদৃশের বেকার-সমস্যা সমাধান করে তাদের একটা পরস্পর-সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সম্পূর্ণতায় রূপান্তরিত করাই হচ্ছে সত্যিকারের কলাসৃষ্টি।

আমার ছবি হচ্ছে রেখায় রচিত শ্লোক বা কবিতা। যদি দৈবক্রমে আমার ছবি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে তা শুধু এই জন্যে যে এর ভিতরে একটা কোনো রূপের ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে। এইটেই চরম—এ ছাড়া তার অন্য কোনো অর্থ নেই। এ সব কোনো ঘটনার বর্ণনাও নয় কিংবা কোনো ভাবাদর্শের ব্যাখ্যাও নয়—নিছক ছন্দের প্রকাশ।—কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট, ঠাকুর স্মৃতি সংখ্যা, ১৯৪১

রবীন্দ্রনাথ এখানে যা বলেছেন, তার মোট কথাটা হচ্ছে এই যে, কাটকুটের উপর কলম চালাতে চালাতে তিনি চিত্রকলার ছন্দের রহস্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন যে হাতেকলমে তিনি যা সৃষ্টি করছেন, সেই ছন্দের বৈচিত্র্য দিয়েই তো বিশ্বসৃষ্টি পরিব্যাপ্ত। "চিত্রলিপি" নামক বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেছেন:

"The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite. The universe has its only language of gesture, it talks in the voice of pictures and dance. Every object in this world proclaims in the dumb signal of lines and colours, the fact that it is not a mere logical abstraction or a mere thing of use, but it is unique in itself, it carries the miracle of its existence."
—Rabindranath, *Chitralipi*

বিপুল বিশ্বের অন্তহীন নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দের জগৎ ক্ষুদ্র একটি বুদ্বুদ মাত্র। অঙ্গ-ভঙ্গির ভাষাই হচ্ছে বিশ্বজগতের ভাষা—সে যখন কথা বলে—আপনাকে প্রকাশ করে, তখন তা করে ছবি ও নাচের ভাষায়। জগতের প্রত্যেক বস্তুই রেখা ও রঙের নীরব ভাষায় এই কথাই বলেছে যে, সে শুধু ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ মাত্র নয়, কিংবা মানুষের ভোগের বা ব্যবহারের বস্তু মাত্র নয়—তার অস্তিত্বের অপূর্ব রহস্য তার নিজের ভিতরেই বর্তমান—বাইরের কোন কিছুর উপরেই তা নির্ভরশীল নয়।—রবীন্দ্রনাথ, চিত্রলিপি

এই উদ্ধৃত বাক্যে রবীন্দ্রনাথ সেই বিচিত্র ছন্দের কথাই বলেছেন। তিনি দেখেছেন বিশ্বের সর্বত্র এই রঙ ও রেখার ছন্দ এবং রঙ ও রেখার মিলনে যে রূপের প্রকাশ, তার ছন্দ। প্রকৃতির এই ছন্দকে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সৌন্দর্যের আদর্শ অনুযায়ী নূতন করে গড়ে তাঁর চিত্রে অতি অপূর্ব ও বিচিত্র রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতির ছন্দকে সুন্দর করে প্রকাশ করাতেই তাঁর চিত্রের সৌন্দর্য। এই কথাটাই অবনীন্দ্রনাথ এই ভাবে বলেছেন :

"রবিকা যা আঁকলেন তা নতুন নয়। যখন সবাই বললে—'এ একটা নতুন জিনিস', আমি বললুম, 'নতুন নয় এ'। নতুন হোতে পারে না। ...রবিকার ছবিতে যা আছে, তা বহু আগে থেকে হয়ে আসছে। যে সব রঙ নিয়ে উনি কারবার করেছেন, নেচারে সে সব আছে। মাঠের ডিজাইন, নদীর জলের ডিজাইন,—দেখো, সব ছড়ানো আছে। রবিকার ছবিও এ সব থেকেই হয়েছে। তাকে নতুন বলব কোন্ হিসেবে? সবই ছিল, সবই আছে নেচারে। রবিকার ছবিতে নতুন কিছু নেই, অথচ তারা নতুন —আমার শুধু এই আশ্চর্য ঠেকে। কেমন করে এই মানুষের হাত দিয়ে এই বয়সে এই জিনিস বের হোল! অতীতের কতখানি সঞ্চয় ছিল তাঁর ভিতরে! অতি গভীর অন্তরের উষ্মা ও তাপে এই রঙ রূপ সমস্তই যেন প্রকৃতির খেলাঘরের লুকানো সামগ্রী হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে নির্মিত; ফেটে বেরিয়েছে, রূপ পেয়েছে।"—আর্ট-প্রসঙ্গ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

এখন, এই ছন্দ বলতে কি বুঝছি এবং তাকে আবার সুন্দর করে প্রকাশ করার মানেই বা কি, তা আলোচনা করা দরকার। প্রথমে ছন্দের কথাই ধরা যাক্।

ছন্দ মানে কি?

ছন্দ বলতে আমরা বুঝি গতির তাল ও ভঙ্গি। সাহিত্যে পদ্য ছন্দ, গদ্য ছন্দ বলতে বুঝবো লেখায় শব্দ থেকে শব্দান্তরে গতির তাল বা স্বরবিন্যাসের ধারা। এক ভাব থেকে অনায়াসে ভাবান্তরে এগিয়ে যাবার যে ক্রমিক ধারা, তাকে বলা যায় ভাবের ছন্দ। প্রকৃতির সৃষ্টিতে রেখায় রঙে রূপে অসংখ্য বিষয়বস্তুর যে অপূর্ব প্রকাশ, তার বিচিত্র ধারায় একটা স্বাভাবিক গতির ছন্দ—জীবনের চাঞ্চল্যের ইঙ্গিত রয়েছে বলেই তাকে বলবো প্রকৃতির ছন্দ। প্রকৃতিতে রেখা, রঙ ও রূপের এই যে ছন্দ, তার বৈচিত্র্যের সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু প্রতিটি ছন্দই একটা গতির ভঙ্গিবিশেষ। গতির দিক থেকে এই ছন্দকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রত্যক্ষ-গতিশীল (dynamic) এবং অপ্রত্যক্ষ-গতিশীল (static)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পলায়মান হরিণের অঙ্গ-ভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ-গতিশীল ছন্দ এবং ঠায়-দাঁড়িয়ে-থাকা হরিণের দেহের প্রান্তরেখার (outline) উপর দিয়ে যদি আমরা চোখ বুলিয়ে যাই, সে রেখার একটা ছন্দ বা গতিভঙ্গি আমরা দেখতে পাবো; কিংবা তার দেহের সুঠাম ডৌলটির উপরে দৃষ্টিপাত করলেও আমরা দেখতে পাব যে অধীর অস্থির জীবনের একটা অপূর্ব ছন্দ রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এই ছন্দই অপ্রত্যক্ষ-গতিশীল ছন্দ।

ক্যালিগ্রাফি বা অক্ষর-লিখন শিল্প

অক্ষর-লিখন শিল্পের কারবারই হোল একমাত্র এই রেখা ও রূপের ছন্দ নিয়ে। এই শিল্পকলায় ভাব প্রকাশের কোনো বালাই নেই। তার একমাত্র কাজই হচ্ছে সাবলীল রেখার ছন্দোময় প্রকাশ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখাসমষ্টির এক অপূর্ব অখণ্ড রূপের সৌন্দর্যে ফুটে ওঠা (rhythms of line and structure)। ক্যালিগ্রাফির এই বিশেষত্ব রবীন্দ্র-চিত্রকলারও বিশেষত্ব বটে। তা বলে রবীন্দ্র-কলাসৃষ্টি নিছক ক্যালিগ্রাফি নয়। প্রাকৃতিক বস্তুরূপের যথাযথ অনুকরণ না করেও, ক্যালিগ্রাফির বিশেষত্ব বজায় রেখে বহু বিচিত্র রূপ ও ভাবের ছন্দোময় প্রকাশই তাঁর চিত্রকলার অনন্যসাধারণত্ব। তাঁর অভিনবত্ব যেমন বিষয়বস্তুতে, তেমনি টেকনিকে। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় এই কথাটাকেই ক্রমে ক্রমে আরো পরিস্ফুট করে তোলা হবে। কিন্তু ক্যালিগ্রাফিই যে তাঁর চিত্রকলার ভিত্তিস্বরূপ, এ কথায় কিছুমাত্র ভুল নেই। তাই রবীন্দ্র-চিত্রকলার সম্যক্ ধারণা করতে হলে, ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। বিশেষত ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধীয় আলোচনার ফলে রেখা ও রূপের ছন্দ সম্বন্ধে আমরা আরো পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারবো।

চীন দেশেই এই শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে এবং ক্রমে তা সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে। চীনের ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধে লিন্ ইউ-তাং তাঁর "আমার দেশ ও আমার জাতি" নামক বইতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। সেই বই থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে দিতে চাই এবং আমি মনে করি, তাতেই ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধে যা বলবার চূড়ান্তভাবে বলা হয়ে যাবে।

"Thus through calligraphy the Chinese scholar is trained to appreciate, as regards lines, qualities—like force, suppleness, reserved strength, exquisite tenderness, swiftness, neatness, massiveness, ruggedness and restraint or freedom ; and as regards form, he is taught to appreciate harmony, proportion, contrast, balance, lengthiness, compactness, and sometime even beauty in slouchiness or irregularity."—Lin yu-tang, *My Country and My People*

ক্যালিগ্রাফি শিখতে গিয়ে চীনের ছাত্রেরা রেখা ও রূপের নানা গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। রেখা সম্বন্ধে তাদের শেখানো হয় রেখার সবলতা, কোমলতা, সংযত সংহত শক্তিশালিতা, সুকুমারত্ব, ক্ষিপ্রতা, পরিচ্ছন্নতা, স্থূলতা, নতোন্নত

বিষমতা এবং সংযম অথবা স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায় এবং রূপের সম্বন্ধে রূপের বিভিন্ন অঙ্গের ভিতরে সঙ্গতি, বৈসাদৃশ্য, অঙ্গানুপাত, ভারসাম্য, দীর্ঘচ্ছন্দতা ও বিভিন্ন অঙ্গের ঘনত্ব বলতেই বা কি বুঝায়। এমনকি, বিকলাঙ্গতা ও বিশৃঙ্খলতার মাঝেও সৌন্দর্য স্ফূর্তি পেতে পারে, তাও তাদের জানতে হয় এবং সে সৌন্দর্য দেখবার চোখ ফুটিয়ে তুলতে হয়।—"আমার দেশ ও আমার জাতি"

"In appreciating Chinese calligraphy, the meaning is entirely forgotten, and the lines and forms are appreciated in and for themselves. . . . A painting has to convey an object, but a well-written character conveys only its own beauty of line and structure".—*Ibid.*

চৈনিক ক্যালিগ্রাফির বিচারে অর্থটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে রাখা হয়—কেবলমাত্র রেখা ও রূপের স্বকীয় দোষ-গুণের বিচার করা হয়ে থাকে......চিত্রাঙ্কনে কোনো একটা বস্তুকে রূপ দিতে হয়, কিন্তু সুন্দর করে লেখা কোনো অক্ষরে কেবল রেখা ও রূপের সৌন্দর্যই প্রকাশ পায়।

"As stated, Chinese calligraphy has explored every possible style of rhythm and form, and it has done so by deriving its artistic inspiration from nature, especially from plants and animals—the branches of the plum-flower, a dried vine with a few hanging leaves, the springing body of the leopard, the massive power of the tiger, the swift legs of the deer, the sinewy strength of the horse, the bushiness of the bear, the slimness of the stork or the ruggedness of the pine."—*My Country and My People*

ছন্দ ও রূপের যত রকমের প্রকারভেদ হোতে পারে, চৈনিক ক্যালিগ্রাফি তা সন্ধান করে জেনে নিয়ে আয়ত্ত করেছে এবং এ কাজে তার কলাগত মৌলিক প্রেরণার উৎস হচ্ছে প্রকৃতি—বিশেষ করে গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টান্ত। যথা—কুলের শাখা-প্রশাখা, শুকিয়ে যাওয়া আঙুর গাছ যার সঙ্গে এখনো বোঁটা আঁকড়ে রয়েছে দু'চারটে ঝুলে-পড়া পাতা, নেকড়ে বাঘের সাবলীল সুঠাম দেহ-ভঙ্গি, ব্যাঘ্রের দুর্ধর্ষ শক্তি, মৃগের বায়ুগতি চঞ্চল চরণ, ঘোড়ার পেশীবহুল দেহ, নিবিড় কেশে ঢাকা ভালুকের দেহ, সরুদেহধারী সারস অথবা রুক্ষদেহ দেবদারু বৃক্ষ।—"আমার দেশ ও আমার জাতি"

"The important thing to observe is that these plants and animal forms are beautiful because of their suggestion of movement."—*Ibid.*

সবচেয়ে এই কথাটাই বুঝতে হবে বিশেষ করে যে, গতির ভঙ্গি প্রকাশ করছে বলেই এই সব গাছ ও পশুর রূপকে সুন্দর বলা হয়েছে।—"আমার দেশ ও আমার জাতি"

"The outline of every tree expresses a rhythm resulting from certain organic impulses, the impulse to grow and reach out toward the sunshine, the impulse to maintain its equilibrium, and the necessity of resisting the movement of the wind. . . . It has not tried to be beautiful. It has only wanted to live. Yet the result is something perfectly harmonious and immensely satisfying".—*My Country and My People*

প্রত্যেকটি গাছের সীমারেখায় এক একটি বিশিষ্ট ছন্দের প্রকাশ। তার অন্তরে যে প্রাণের প্রবাহ সদা বহমান, তারই ফলস্বরূপ এই অপরূপ ছন্দের উদ্ভব হয়েছে। সে যে বাড়তে চাচ্ছে—সে যে সূর্যের আলোর দাক্ষিণ্যের পানে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে—নিজ দেহের ভারসাম্যরক্ষা ও বায়ুবেগের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে, তার ফলেই তার দেহে এই প্রাণের ছন্দ লীলায়িত হয়ে উঠেছে।... সে যে সুন্দর হবার জন্যেই চেষ্টা করে সুন্দর সুঠাম হয়ে উঠেছে, তা নয়। সে কেবল বেঁচে বর্তে থাকবারই চেষ্টা করছে মাত্র। কিন্তু তার ফলেই সে হয়ে উঠেছে এমন একটা কিছু, যা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ও সর্বরকমে প্রীতিপ্রদ।—"আমার দেশ ও আমার জাতি"

"It is exactly this beauty of movement which is the key to Chinese calligraphy. Its beauty is dynamic and not static, and because it expresses a dynamic beauty, a beauty of momentum, it lives, and it too is infinitely variable without exhaustion. A swift, sure stroke is appreciated because it is made swiftly and powerfully at one stroke, thus possessing a unity of movement, defying imitation or correction, for any correction is immediately detected as disharmonious. Incidentally, that is why calligraphy as an art is so difficult.—*My Country and My People*

এই গতির সৌন্দর্যই হচ্ছে চৈনিক ক্যালিগ্রাফির চাবিকাঠি। এই সৌন্দর্য গতিশীল সৌন্দর্য, স্থিতিস্থাপক নয় এবং গতিশীল সৌন্দর্যের প্রকাশক বলেই চৈনিক ক্যালিগ্রাফি জীবনের ছন্দে ছন্দিত এবং সেই জন্যেই তার প্রকার-ভেদেরও অবধি নেই। ক্ষিপ্রহস্তে এক-টানে-আঁকা রেখার সবল দ্বিধাহীন টানের তারিফ কে না করে!

কিন্তু তারিফ করে এই জন্যেই যে, সবল হস্তে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক-টানে-আঁকা বলেই সে রেখায় গতির একটা অখন্ড ঐক্য প্রকাশ পায় এবং তার ফলে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয় যে তার অনুকরণ বা সংশোধন একেবারেই অসম্ভব। সামান্যমাত্র পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা মাত্রই ধরা পড়ে যাবে যে, তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত এই জন্যেই বিভিন্ন রকমের কলার মধ্যে ক্যালিগ্রাফি বা রেখাক্ষর শিল্পকলা এত শক্ত।—"আমার দেশ ও আমার জাতি"

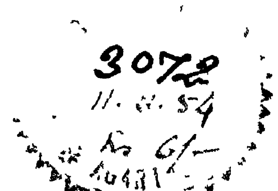
"The dynamic principle of movement results in a principle of structure which is essential to an understanding of Chinese calligraphy. The mere beauty of balance and symmetry is never regarded as the highest form."—*My Country and My People*

চৈনিক ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হোলে এই কথাটা বোঝা বিশেষ প্রয়োজন যে, প্রকৃতির নিয়মেই গতি রূপে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ ছন্দের ভিতরে যে বেগের আবেগ রয়েছে, তার বিশেষত্ব অনুসারে রকম-রকমের রূপ রূপায়িত হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র সুষ্ঠু ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গবিন্যাসের সৌন্দর্যই যে শ্রেষ্ঠ রূপের শেষ কথা, কেউ তা মনে করে না।

"The difference between this beauty of momentum and beauty of merely static proportion is difference between the picture of a man standing or sitting in a resting position and the snapshot of a man swinging his golf-stick or of a football player who has just sent the ball soaring through the air."—*My Country and My People*

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা কিংবা বিশ্রামের আরাম-আসনে বসে-থাকা কোনো মানুষের চিত্র এবং গলফ্ খেলার লাঠি বাগিয়ে ক্রীড়া-রত কোনো মানুষের ছবি কিংবা কোনো ফুটবল খেলোয়াড়ের চিত্র যে এই মাত্র পায়ের আঘাতে বলটাকে আকাশে তুলে দিয়েছে—এই দুইয়ের ভিতরে যে পার্থক্য, ঠিক সেই পার্থক্যই বিদ্যমান গতিশীল রূপের সৌন্দর্য এবং স্থিতিস্থাপক সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সৌন্দর্যের মধ্যে—"আমার দেশ ও আমার জাতি"

রেখার ছন্দ ও রূপের ছন্দ বলতে কি বোঝায়, তা এখানে বলা হোল। রেখার কি কি গুণ থাকলে রেখা ছন্দোময় হয়ে ওঠে এবং রূপের কি কি গুণ থাকলে রূপ ছন্দোময় হয়ে ওঠে, তা প্রথম উদ্ধৃত বাক্যেই বলা হয়েছে। বাকী উদ্ধৃত বাক্যগুলি তারই বিশদ ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা যেতে পারে। আসল কথা হচ্ছে, একটি সঙ্গতিপূর্ণ



অনায়াস গতির আবেগ যদি রেখার টানে ফুটে ওঠে, তবেই রেখা ছন্দোময় হবে এবং সেই ছন্দোময় রেখার সুষ্ঠু সমবায়ে যদি একটা সঙ্গতিপূর্ণ অখণ্ড রূপ প্রকাশলাভ করে, তবেই তাকে ছন্দোময় রূপ বলা যাবে।

ছন্দের সৌন্দর্য মানে কি?

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন—প্রকৃতির ছন্দকে সুন্দর করে প্রকাশ করার মানে কি? অর্থাৎ ছন্দের সৌন্দর্য বলতে কি বুঝবো? যে কোনো গতির ছন্দই আমাদের কাছে সুন্দর বলে প্রতীয়মান না হোতেও পারে। কোন্ ছন্দ আমাদের মনে কি ভাব জাগায়, তার উপরেই নির্ভর করে, তা আমাদের কাছে সুন্দর, কি কুৎসিত। যদি আমাদের মনে অপ্রীতিকর ভাবের সৃষ্টি করে, তবে তা কখনো আমাদের সুন্দর মনে হোতে পারে না। তারপরে, একজনের কাছে যা সুন্দর, আর একজনের চোখে তা সুন্দর নাও হোতে পারে। আসলে, সুন্দর কুৎসিত আমাদের মনে এবং মন প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন। তাই মনের প্রতীতিও ভিন্ন ভিন্ন না হোয়ে পারে না। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"In fact, forms in the external sense are without beauty and without ugliness. . . . Truly speaking, there is nowhere such a thing as beauty and ugliness except in our mind."- A. N. Tagore, *Sadanga*

প্রকৃতপক্ষে বস্তুর যে নিজস্ব রূপ, তা সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়।......সত্যি বলতে, আমাদের মন ছাড়া আর কোথাও সুন্দর বলেও কিছু নেই, কুৎসিত বলেও কিছু নেই। —"ষড়ঙ্গ"

অবনীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন : "ছবির গোড়াকার কথা হচ্ছে রূপভেদ। একটা গাছকে দেখছি—দেখি তার ভিতরে human quality (মানুষী ভাব)। রবিকা গান গেয়েছেন—'তুমি কে গো? আমি বকুল।' যেন কিশোরী মেয়েটি ঝরে যাবে দুদিন বাদে। 'তুমি কে গো? আমি পারুল।' হাসি-খুশিতে ভরা, আর সাজ-সজ্জার বাহারে উজ্জ্বল, তার যেন বিশেষ একটা গর্ব আছে। 'আমি শিমুল'—একটু লজ্জিত, একটু কুণ্ঠিত,—যেন সুকুমারী। তিনি তো শুধু ফুল দেখেননি, দেখেছেন তার ভিতরে এই সব human qualityর (মানুষী ভাবের) রূপ। এই যে রূপ-ভেদ—আমরা দুই-ই দেখি। মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা, তাই এসে যায় মানুষই। রূপ is form, চোখে দেখি, মনেও দেখি। দুটো রূপ। মানুষের মনে

যা দেখি, তা মানুষিক ভাব, আর চোখে দেখি প্রকৃতির ভাব। এই দুই মিলিয়ে সৃষ্টির পরিপূর্ণতা। দুই থাকা চাই। মনের দেখাও থাকা চাই, চোখের দেখাও থাকা চাই।" ("আর্ট প্রসঙ্গ"—অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)

প্রকৃতির রাজ্যে যে রঙ, রেখা ও রূপের ছন্দোময় সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ, তার হুবহু অনুকরণ আর্ট নয়—তা হচ্ছে ফটোগ্রাফি। একটা কিছু দেখে হয়তো আমার মনে হয়েছে 'সুন্দর'। অপরের চোখে তা 'সুন্দর' বলে মনে না হোতেও পারে, কিংবা যে কারণে আমার 'সুন্দর' মনে হয়েছে, সে কারণটা হয়তো অপরের চোখেই পড়েনি—তার 'সুন্দর' মনে করার কারণ হয়তো অন্য কিছু। দৃষ্টির এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তাকে হুবহু রূপ দেওয়া নয়—তাকে রঙে ও রেখায় মনের মতো রূপের মাঝে ছন্দশীল সুষমায় ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে আর্ট।

"Art is not truth, it is not nature ; it is a pattern or rhythm of design that we impose on nature." (P. Thoe1e)

কলা বাস্তব সত্য নয়—প্রকৃতির হুবহু নকল নয়। কলা হচ্ছে আমাদেরই মনের কল্পনা-প্রসূত রূপের ছন্দ, যা আমরা প্রকৃতিতে আরোপ করে প্রকৃতিকেই সেই ছন্দে ছন্দিত বলে মনে করি। তবেই দাঁড়াচ্ছে এই যে, আর্ট হচ্ছে বাইরের বস্তুর যে সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়েছে, অর্থাৎ আমার সৌন্দর্যানুভূতির ধারণার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে, রঙে রেখায় তারই ছন্দোময় প্রকাশ—অবিকল নকল নয়। এ কথা রবীন্দ্রনাথের যে কোনো ছবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথ এক একদিন শ্রীমতী রাণী চন্দকে বলতেন—"বোস্ দেখি, তোর ছবি আঁকি।" এই রকম করে তিনি তাঁর কয়েকখানা ছবিই এঁকেছেন। শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ বলেছেন যে একখানা ছবিও দেখতে তাঁর মতো হয়নি—এতে তাঁর প্রথম প্রথম মনে দুঃখ হোত। একদিন তাঁর এক ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথ বললেন—"দেখ্ দেখি, তোকে আমি কত রূপে দেখছি—তোর অহঙ্কার হওয়া উচিত" ইত্যাদি। এর মানে হচ্ছে এই যে, ছবি আঁকার সময়ে তাঁর যে বিশেষত্বটির প্রতি সাময়িক ভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সেইটিকে তিনি কোনো একটা রূপের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন—শ্রীমতী রাণী চন্দের সাধারণ চেহারার সঙ্গে সে রূপের হয়তো কিছুমাত্র মিল নেই। এখানে তিনি শ্রীমতী রাণী চন্দকে আঁকেননি—তাঁকে উপলক্ষ করে তিনি নিজের মনের সৌন্দর্যানুভূতিকেই রূপ দিয়েছেন, অর্থাৎ বাইরেকার কোনো বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের সৌন্দর্যকে নিজের সৌন্দর্যানুভূতির কাঠামোর মধ্যে ফেলে নূতন করে প্রকাশ করেছেন।

কলা ব্যক্তিনিষ্ঠ

তাই বলা হয়, শিল্পকলা সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ। কলাশিল্পী তাঁর শিল্পে নিজেকেই প্রকাশ করেন—সে শিল্প তাঁর মনের অনাবিল আনন্দের অকারণ সৃষ্টি। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা নিজের কথাই নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া যাচ্ছে :

"যে জিনিস দেখে আনন্দ পেয়েছি—সেই আনন্দ, সেই রস যখন অন্যের ভিতরে চালনা করে দেওয়া যায়, তাকেই বলে আর্ট; তা তুমি ছবি এঁকেই পারো বা সাহিত্যে, নয় গানে।

"ছবির কথা কিছুই বুঝিনে। ওগুলো স্বপ্নের ঝাঁক, ওদের ঝোঁক রঙিন নৃত্যে। এই রূপের জগৎ বিধাতার স্বপ্ন—রঙে রেখায় নানাখানা হয়ে উঠেছে। বসন্তে পলাশ ফুটে উঠল, কালোয় রাঙায় একটা রূপ। কিসের গরজ? কে জানে? মানে কি যদি জিজ্ঞাসা কর, তার উত্তর কে দেবে? আপনা আপনি সৃষ্টিকর্তার তূলির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আবার বেল-ফুল আর এক মূর্তি ধরে বসল কেন? অজানার স্বপ্ন-উৎস থেকে বিচিত্র রূপ উৎসারিত—এ সম্বন্ধে বিশ্বকর্মার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। আমার ছবিও তাই, রূপের নিগূঢ় আনন্দ নানা রূপে রূপে লীলা করছে, সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই আনন্দ দর্শকের মনেও যদি সঞ্চারিত হয় তো ভালো—নইলে কারো কোনো ক্ষতি নেই। সৃষ্টি কেন হয়, তার ব্যাখ্যা অসম্ভব—সকলের গোড়াকার কথাটাই হচ্ছে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'"।—সরসীলাল সরকারকে লিখিত, ২৬ ফাল্গুন ১৩৩৮

কিন্তু শুধু যে দৃষ্ট বস্তুর সৌন্দর্যানুভূতিকেই রূপ দেওয়া আর্টিস্টের কাজ, তা মনে করলে ভুল হবে। নব নব রূপ, নব নব ছন্দ, নব নব সৌন্দর্যের সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইচ্ছা ও অনুভূতি সাপেক্ষ। এমন কি, সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত সৃষ্টি-ছাড়া অদ্ভুত রূপ-সৃষ্টির স্বাধীনতাও তাঁর নিশ্চয় আছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা বলেছেন, তার খানিকটা উদ্ধৃত করে দিলে বুঝবার পক্ষে সুবিধা হবে। তিনি বলেছেন:—

"বিধাতা মানুষকে গড়লেন একটু লাবণ্য, একটু সৌন্দর্য দিয়ে; বললেন: ঐ টুকু আর হাত দেব না, ব্যস—তোমরা তৈরি করে নাও। এই নিজেকে সম্পূর্ণ করার সাধনাই মানুষের আর্ট।

"সৃষ্টি মানে নয় যে অবিকল তার পুনরাবৃত্তি করবে। মাঠে ঘাটে যা দেখি—বিকৃতি, দারিদ্র—সে তো আছেই। আমি তাকে অতিক্রম করে, মিথ্যেই বলো,

আর সত্যিই বল্—আর একটা রূপ দেব, অন্য চোখে দেখব। সেকালে রাজপুত্তুর, রাক্ষস এ সবের ছবি করেছে, গল্প বানিয়েছে। এই সব শোনায় মা তার শিশুকে। আধুনিকেরা ভাবে, এ সব কি! এখন তারা হাসে যে এ সব বাস্তব নয়; তারা বাস্তব আনছে।

"স্বপ্ন বলে একটা পদার্থ আছে, বরাবর মানুষ সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছে। আমার হাতেই তা আছে, যা পাইনি। শিল্পী তুলি নিয়ে বসল, আপন অন্তরের যা রূপ ফুটিয়ে তুলল। যা বিধাতা পারেন নি, আমার হাতে ভার ছিল, তাই দেখিয়েছি।"—"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"—শ্রীরাণী চন্দ

"একটা উটপাখি বা লম্বা গলাওয়ালা জিরাফ—আমি হয়তো দেখিই নি কোনো দিন, কিন্তু কিছু অদ্ভুত জন্তু এঁকেছি;—মানতেই হবে যে একটা কিছু অদ্ভুত এতে আছে। এই যে আর্টের একটা দাবি আছে, এমন করে আপনাকে প্রত্যক্ষ করে, তা তুমি যে পন্থীই হও. তোমাকে মানতেই হবে। যা চোখের সামনে আছে, যা প্রতিদিন দেখছি, তা যথেষ্ট নয়। একটা বিশেষ কিছু দেখতে হবে, তার সম্মিলনেই এর পরিপূর্ণতা।" —"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"—রাণী চন্দ

এই যে চোখের সামনে যা দেখছি, তার ভিতরে একটা বিশেষ কিছু দেখা, তার মানে কি? মানে হচ্ছে, সেখানে এমন একটা কিছু দেখা, যার সত্যিকার অস্তিত্ব সেখানে নেই, কিন্তু আমি আমার কল্পনা-বলে কোনো একটা কিছুর আভাস সেখানে ফুটে উঠেছে বলে' মনে করতে পারি। এটা হোল বাইরের বস্তু-সংস্থানের অবলম্বনে আমারই মনের অভিনব সৃষ্টি। মনের এই সৃষ্টিকে রঙ, রেখা ও রূপের ছন্দে প্রকাশ করার নামই হচ্ছে আর্ট। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যখন ছবি আঁকতে শুরু করি, আমার একটা পরিবর্তন দেখলুম। দেখলুম গাছের ডালে, পাতায় নানা রকম অদ্ভুত জীব-জন্তুর মূর্তি। আগে তা দেখিনি। আগে দেখেছি, বসন্ত এল, ডালে-ডালে ফুল ফুটল—এই সব। এ একেবারে নূতন ধরনের দেখা। কিন্তু এই রিয়ালিস্টিক মূর্তি কে দেখালে? আর্ট দেখালে। সে বললে এ অন্যকেও দেখাতে। এই যে দেখার সম্পদ, এ চারি দিকে বিস্তার করে এসেছে মানুষ। কেন বলে ওঠো—'বা'! সুন্দর বলে নয়, দেখবার বলেই। এইটে হচ্ছে আমাদের আর্ট। দৃষ্টির ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিচ্ছে। যা দেখেনি, তাকে যখন দেখে—অবাক হয়ে যায়। এই জন্যেই তো প্রত্যক্ষ দেখার এত আনন্দ। এই যে দেখা, এ হচ্ছে ছবির দেখা।"

রবীন্দ্র-চিত্রকলার টেকনিক ও বিষয়বস্তু

যা দেখছি তার ভিতর একটা নূতন কিছু দেখাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ছবির দেখা।' তিনি তাঁর এই 'ছবির দেখা' অন্যকেও দেখাতে বসলেন নিজের খুশি মতো ছবি এঁকে এঁকে। কেমন করে দেখালেন, এখন তাই দেখা যাক।

আভাসে-ইঙ্গিতে রূপের প্রকাশ

প্রথম কথা, তিনি যে গাছের ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় জীব-জন্তুর মূর্তি দেখলেন, সে জীব-জন্তুও সেখানে নেই, কিংবা তাদের হুবহু চিত্র সেখানে আছে বলেও কল্পনা করা যায় না—কেবল একটা রূপের অস্পষ্ট আভাস-মাত্র ফুটে উঠেছে মনে করা যায়। কখনো হয়ত মনে হয় যে, শুধু মুখের ডৌলটি, কিংবা শুধু একটা বা দুটো চোখ, কিংবা ঝাঁকড়া একটা মাথা, কিংবা মুখের একটা ভঙ্গি, কর্মতৎপর দেহের অংশ-বিশেষের একটুমাত্র আভাস। মানস-চক্ষে তিনি প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ যা কিছু দেখলেন, তাকেই তিনি তাঁর চিত্রে রূপ দিলেন। কিন্তু তা-ও হুবহু নকল করে নয়। আভাসে-ইঙ্গিতে রূপ ও ভাব প্রকাশের কৌশল সম্বন্ধে শুধু তিনি প্রকৃতির কাছে পাঠ নিলেন। তারপরে, নিঃসঙ্কোচ, সবল, সাবলীল ছন্দোময় রেখার রকমারি টানের সন্নিবেশে কিংবা আলোছায়ার সম্মিলনে রকম রকম রূপের আভাস জাগিয়ে তুলতে লাগলেন—সত্যিকার ডালপালা এঁকে নয়। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের "খাপ-ছাড়া" বইয়ের ছবিগুলি দ্রষ্টব্য। এই ছবিগুলিতে তিনি একদিকে অসংখ্য রেখার রকমারি টান ও অদ্ভুত বুনানির ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট রূপের আভাস জাগিয়ে তোলার চেষ্টা পেয়েছেন এবং অপর দিকে স্বল্প থেকে স্বল্পতর রেখার অনাড়ম্বর স্পষ্টতার ভিতর দিয়ে নানা ভাব ও রূপের ইঙ্গিত অথবা বিশেষ কোনো অঙ্গভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে আশ্চর্য রকম কৃতকার্যতা লাভ করেছেন।

'খাপছাড়া' ও 'সে'—এই দুখানা বইয়ের ছবিগুলিতে রেখার কমবেশি করে ও টানের অসংখ্য রকমারি করে ছবির ও ছবি-আঁকার আঙ্গিকের কত যে অফুরন্ত

বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, তিনি শুধু রূপ ও ভাবের আভাস জাগিয়েছেন, সম্পূর্ণ মূর্তি বা বাস্তব মূর্তি আঁকেননি। এই ছবিগুলিতে তিনি মানুষ, পশু, গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা মনগড়া বা গাছের ডালে-পাতায় দেখা অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ারের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু বাস্তবের অনুকরণের কিছুমাত্র চেষ্টাও করেননি। অদ্ভুত মূর্তি আঁকার একটা চমৎকার উদাহরণ "খাপছাড়া" বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠার ছবিটি। 'সে' বইয়ের ৪৮, ৯২, ৯৫ ও ৯৭ পৃষ্ঠার ছবিগুলিও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই চিত্রগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে নিঃশঙ্ক সাবলীল সুকুমার রেখারাজিকে একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সম্পূর্ণতায় ফুটিয়ে তোলা। অতিশয় অস্পষ্ট রূপের আভাস জাগিয়ে তোলার উদাহরণ হিসেবে "খাপছাড়া"র ২০, ৩৮ ও ১১৬ পৃষ্ঠার ছবিগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। "সে" বইয়ের প্রথম সংস্করণ থেকে দৃষ্টান্তগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত যে ছবিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হোল, তার সবগুলিই কলমের আঁচড় কেটে আঁকা। 'খাপছাড়া'র সবগুলি ছবিই এই ধরনের। কিন্তু 'সে' বইয়ের ১, ২, ১৬, ১০৯, ১৩২ ও ১৩৭ পৃষ্ঠার ছবিগুলি তুলির আঁকা; ৭, ৯৭, ১০৩, ১১৮, ১২২ ও ১২৫ পৃষ্ঠার ছবিগুলি পেনসিলের; ৩৭, ৩৮ ও ১১৪ পৃষ্ঠার ছবিগুলি মনে হয় খানিকটা তুলির ও খানিকটা কলমের আঁকা এবং ৮ ও ১৪৬ পৃষ্ঠার ছবি দু'খানা সম্ভবত ছেঁড়া কাগজ বা কাপড়ের টুকরো রঙে ভিজিয়ে চেপে চেপে আঁকা। তবে রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো ছবি আঁকতেই একটু হয়তো তুলি, একটু কলম—তার সঙ্গে কলমের বাঁট, তুলির বাঁট, পালকের কলম, খাগের কলম বা ফাউন্টেন পেন—যখন যা খুশি ব্যবহার করতেন। কাজেই তাঁর কোনো ছবি তুলির বা কলমের আঁকা না বলে প্রধানত তুলির বা কলমের আঁকা বলা উচিত। এর কোনো ছবিতেই তিনি বাস্তব রূপ বা সম্পূর্ণ মূর্তি আঁকেননি—এগুলিরও বিশেষত্ব হচ্ছে, রকমারি রেখার সমাবেশে বা আলোছায়ার সাহায্যে রূপের বা ভাবের আভাস জাগানো। এই ভাবে ছবি আঁকার পথ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের চিত্রকলাকে ধরাবাঁধা সুনির্দিষ্ট টেক-নিকের নিগড় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই জন্যেই বলা হয় যে, পাশ্চাত্য জগতের আর্ট-আন্দোলন বহু বৎসর থেকে যে মুক্তির সন্ধানে ব্যস্ত, তার কৌশল রবীন্দ্রনাথের চিত্রে অতি স্বচ্ছন্দ, সহজ, অনায়াস ভঙ্গিতে প্রকাশ লাভ করেছে। তাই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলার এক নব পর্যায়ের স্রষ্টা ও প্রবর্তক।

টেকনিক ও বিষয়বস্তু

রবীন্দ্র-টেকনিক

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছবির দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি, প্রকৃতির ছন্দকে নূতন ও সুন্দর করে প্রকাশ করার মানে কি? এই আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়বস্তু বা ভাব এবং ছবি-আঁকার টেকনিক সম্বন্ধেও খানিকটা আভাস দেওয়া হয়েছে। তিনি বিদেশী কোনো ধরাবাঁধা টেকনিকই অনুসরণ করেননি। কোনো নূতন টেকনিক যে তিনি গড়ে তুলেছেন, এমন কথাও বলা যায় না। তাঁর চিত্রকলার বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট টেকনিক নেই—এই কথা বলাই অধিকতর সঙ্গত এবং এইটেই তাঁর চিত্রকলার বিশেষত্ব। তাই বিষয়বস্তু থেকে আলাদা করে তাঁর চিত্রকলার টেকনিক সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। তাই টেকনিক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হয়ে যায় এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলতে গিয়েও টেকনিক সম্বন্ধে বলা হয়ে যায়।

ছবি আঁকা সম্বন্ধে প্রথম কথা হোল ছবির বিষয়বস্তু বা ভাব—কি আঁকবো, সে সম্বন্ধে মন স্থির করা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ডিজাইন। তার মানে, স্থিরীকৃত বিষয় বা ভাবটাকে চিত্রে সম্যক্‌ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চিত্রপটে বস্তুসংস্থান, রঙের সমাবেশ ও অলঙ্কারের ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া চাই, তা কল্পনায় স্থির করা। তৃতীয় কথা হচ্ছে, মনের কল্পনাকে রঙে-রেখায় রূপ দেওয়া—হাতে-কলমে এঁকে তোলা। শেষ কথা: লাবণ্য-যোজনা—ইংরেজীতে যাকে বলে ফিনিশ। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত আগে থেকে বিষয়বস্তু স্থির করে নিয়ে ছবি আঁকতে বসতেন না। অনেক সময়ে ছবি আঁকতে বসেও তিনি নিজেই জানতেন না কি আঁকবেন। কখনো কখনো হয়তো একটা কোনো ধারণা নিয়েই ছবি আঁকতে বসতেন, কিন্তু হয়ে উঠতো হয়তো অন্য একটা কিছু; কখনো বা সেই ধারণাটাই হয়তো তাঁর ছবিতে ফুটে উঠতো সামান্য পরিবর্তিত আকারে। তাই ডিজাইনের কল্পনাও তিনি আগে থেকে করতেন না বটে, কিন্তু ডিজাইনের বিশেষত্ব আপনা থেকেই তাঁর ছবিতে প্রকাশ পেত। আর লাবণ্য-যোজনা সম্বন্ধেও তিনি হিসেব করে সজ্ঞানে কখনো চেষ্টা করতেন না—আঁকতে আঁকতে যখনই তাঁর মনে হয়েছে যে বেশ একটা কিছু হয়ে উঠেছে, তখনই তিনি শেষ করে দিয়েছেন—আর তাতে হাত লাগাননি।

পূর্বেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে কোনো ধরাবাঁধা চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি অনুসরণ করেননি কিংবা নিজেও কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গড়ে তোলেননি। অথচ বিনা-পদ্ধতিতে কলম বা তুলি চালাতে চালাতে তিনি যা এঁকে তুলতেন, তার

অনেকগুলিকেই কোনো-না-কোনো চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির অন্তর্গত বলে মনে করা যেতে পারে। এই যে সজ্ঞানে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করেও, করলে যেমনটি হোত, তেমনটিই তিনি এ'কে তুলেছেন নিজের অজ্ঞাতসারে, এইটে তাঁর ছবির একটা বড়ো বিশেষত্ব। তবে এ কথাও খুব সাধারণ ভাবেই প্রযোজ্য—কোনো পদ্ধতিরই খ‍ুঁটিনাটি খুব সুষ্ঠুভাবে তাঁর ছবিতে ফুটে উঠেছে, এমনটা দেখা যায় না। সেরূপ করতে পারা তাঁর পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না। কেননা, তার জন্যে সেই নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে দীর্ঘ দিন ধরে যে সযত্ন শিক্ষার প্রয়োজন, নিয়মের কঠিন নিয়মে বাঁধা সেরূপ শিক্ষায় তিনি কোনো দিনই নিজেকে রপ্ত করে তুলতে পারেননি। কোনো একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা দৃশ্যের ছবি আঁকবো ভেবে তিনি ছবি আঁকতে বসতেন না। কলম বা তুলি চালাতে চালাতে তাঁর অবচেতন মনে সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে হঠাৎ কোনো রূপের আভাস তাঁর চেতন মনে ভেসে উঠতো। তখন সেই রূপকেই তিনি রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তুলতে লেগে যেতেন। শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের কাছে শুনেছি, তাঁকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, ছবি আঁকতে আঁকতে এক-একটা রূপ এমনভাবে তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠতো যে তিনি চোখে সেই রূপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না এবং যে পর্যন্ত না সেই রূপ তাঁর ছবিতে আত্মপ্রকাশ করতো, সে পর্যন্ত তা তাঁর চোখের সামনে থেকে বিলুপ্ত হোত না। তখন তাঁকে এমন একটা প্রেরণায় পেয়ে বসতো যে অতিশয় দ্রুত তালে তাঁর কলম বা তুলি চলতে থাকতো। সেরূপ অবস্থায় তিনি আস্তে আঁস্তে কাজ করার সবুর সইতে পারতেন না। তাঁর এই অসহিষ্ণুতার জন্যেই তৈলচিত্র আঁকা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হোল না। এক সময়ে তৈলচিত্র আঁকবার চেষ্টাও তিনি করেছেন। কিন্তু তৈলচিত্রের রঙ তাড়াতাড়ি শুকোয় না বলে তিনি ধৈর্য রক্ষা করতে পারতেন না। তিনি সাধারণত জল-রঙ নিয়ে কাজ করতেন। কিন্তু তা-ও যাতে তাড়াতাড়ি শুকোয়, সে জন্যে তার সঙ্গে স্পিরিট মিশিয়ে নিতে হোত। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ছবি আঁকার সময়ে তাঁর মনটা এত তাড়াতাড়ি চলতে থাকতো—ছবি আঁকার প্রেরণা এত তীব্র হয়ে উঠতো যে, তাঁর হাতের কলম বা তুলি তাঁর মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ'টে উঠতে পারতো না।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমতী চন্দ বললেন: "রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার সময়ে কাউকে সামনে থাকতে দিতেন না। অনেক দিনের কথা। তখন আমি খুব ছোট। কলকাতায় দাদার বাসায় বসে তিনি ছবি আঁকতেন। কাউকেই কাছে ঘে'সতে দিতেন না। কেবল আমি খুব ছোট ছিলাম বলে আমাকে কাছে বসে থাকতে বাধা দিতেন না। ক্রমে ছবি আঁকার সময়ে আমার সামনে থাকা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের

পর যখন আমি শান্তিনিকেতনে এলাম, তখন থেকে তো আমি সামনে না থাকলে তাঁর ছবি আঁকাই চলতো না। যখনই ছবি আঁকতে বসতেন, তখনই আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমাকে সর্বদা তাঁর কালি-কলম রঙ-তুলির পাহারা দিতে হোত। কোন্ রঙের তুলি বা কোন্ কালির কলম যে কখন তাঁর প্রয়োজন, সে খেয়াল তাঁর থাকতো না। তাঁর আঁকা দেখতে দেখতে আমার এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম, কখন কোন্ রঙটা তাঁর প্রয়োজন এবং আমি তাড়াতাড়ি সময়মতো সেই রঙটা তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিতাম। নইলে হাতের কাছে যে রঙ পেতেন, তাতেই তুলি বা কলম ডুবিয়ে একটা অনর্থ করে বসতেন, হয়তো ছবিটাই নষ্ট করে ফেলতেন। এত তাড়াতাড়ি তিনি হাত চালিয়ে যেতেন যে মনে হোত যেন তাঁর এক মুহূর্ত সবুর সয় না।”

রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিষয়বস্তু

রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এইটেই বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য এবং সবচেয়ে বড়ো কথা যে তিনি তাঁর চিত্রে রূপাতীত সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। তাঁর চিত্রকলায় কত যে বিচিত্র ভঙ্গির ছন্দোময় রেখা ও কত যে রকমারি অপূর্ব বর্ণবিন্যাস, তার অন্ত নেই। কিন্তু সেই বর্ণ ও রেখার বুনানিতে মানব-মনের অতি সূক্ষ্ম উৎকণ্ঠা ও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়ানুভূতির ইন্দ্রজাল অপূর্ব কৌশলে রূপ পরিগ্রহ করেছে, কখনো বা রূপের মাঝে শুধু একটা রূপাতীত সৌন্দর্যের আভাস ফুটে উঠেছে। সাদা কাগজের বুকে কলম বা তুলির এক টানে একটি মূর্তি জেগে উঠলো—হয়তো একটি মানুষের মুখের একটুখানি আভাস, যেমন একটুখানি আমরা স্মৃতিতে ধরে রাখি—কপোলের ডৌলটি, মুখের ভাঁজটি, হাতের বিশেষ ভঙ্গিটি, চোখের উপরে ভ্রূর টানটি ইত্যাদি। রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে রূপ সবই মুখ্যত ভাবাত্মক—রেখা ও বর্ণ রূপকে বরণ করেও অরূপেরই আরাধনা করে। “সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর” —এইটেই তাঁর চিত্রকলারও মর্মকথা। তিনি যে গাছের ডালে-পাতায় নানা রকম মূর্তি আবিষ্কার করেছেন, তার মানেই হচ্ছে অসীম আকাশের পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ ডালপালার সমাবেশে প্রত্যক্ষাতীত রূপের সৃষ্টি। সে রূপ তো আর সত্যই সেখানে নেই। সে-টা নিছক তাঁর মনের কল্পনা এবং সেই কল্পনাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর চিত্রে অভিনব কৌশলে। যখন কোনো ভাবকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন তাঁর চিত্রে, তখন সেই ভাবের দ্যোতক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মধ্যে এমন দু’ একটিকে শুধু তিনি তাঁর চিত্রে স্থান দিয়েছেন, যাতে সেই ভাবের আভাস অনায়াসে

যে কোনো কলারসিকের চিত্তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। তার মানেই হচ্ছে রূপহীন ভাবের অসীমতার পরিপ্রেক্ষিতে রেখা ও রঙের সাহায্যে অসীমের আপন সুর বাজানো। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর "বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী"তে এক জায়গায় বলেছেন "এমনি রূপ সমস্ত দিকে-দিকে জলে-স্থলে আকাশে বন্দী থাকে—আর্টিস্টকে খোঁজে তারা সবাই; তাদের নিয়ে লীলা করবে, এমন এক এক জন খেলুড়ি আর্টিস্টকে খুঁজে ফিরছে বিশ্ব-জোড়া রূপ সকলে।" লতাপাতার সীমানায় অনন্ত আকাশের অতি ক্ষুদ্র একটুখানি টুকরো হয়তো রূপের মাঝে বন্দী হয়ে আছে। কিন্তু সকলে সে বন্দীরূপকে দেখতে পায় না—তারা হয়তো নিছক লতাপাতাই শুধু দেখে। "রূপের ঠাট এক বাইরের মতো, আর এক মনের মতো, ফটো দেয় বাইরের ঠাট, রূপদক্ষ দেন মনোমতো রূপের ঠাট সমস্ত"—(অবনীন্দ্রনাথ) এবং তখনই সে রূপ রস-মূর্তি হয়ে ওঠে—আর্টিস্টের প্রীতির পরশে অমনি তা অমৃতের অর্ঘ লাভ করে—আর্টের বিষয়-বস্তু হোয়ে দাঁড়ায়। এই কথাটাকেই রবীন্দ্রনাথ "আরোগ্যে"র দ্বিতীয় কবিতাটিতে সুন্দর করে বলেছেন :

"পরম সুন্দর
আলোকের স্নান-পুণ্য প্রাতে।
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রস-মূর্তি করিছে রচনা,
প্রতিদিন
চির নূতনের অভিষেক
চির পুরাতন বেদী-তলে।
* * *
সব কিছু সাথে মিশে' মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্ঘ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চির মানবের সিংহাসন।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলেছেন :

"People often ask me about the meaning of my pictures. I remain silent, even as my pictures are. It is for them to express and not to explain."

* লোকে অনেক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার ছবির অর্থ কি? আমি চুপ করে

থাকি, যেমন চুপ করে থাকে আমার ছবি। ছবির কাজ শুধু ফুটে ওঠা—যা প্রকাশ্য ছিল না, তাকে প্রকাশ করা—তার অস্তিত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা নয়।

বিলেতে অবস্থানকালে সে দেশের এক পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন —"কবি, তুমি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি আঁক কেন? দেখে মনে হয় যেন কোনো জন্তু, কিন্তু বিশ্বের কোনো জন্তুর সঙ্গেই তার মিল নেই। এর মানে কি?" রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেছিলেন—"ঈশ্বর যে ডিনোসউর্, হিপোপটেমাস্ এবং আরো কত যে কিম্ভূত-কিমাকার জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তার মানে কি? আমার এ সব ছবি সম্বন্ধেও সেই কথা—কোনো মানে নেই।"

বিষয়বস্তুর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গাছপালা লতাপাতার চিত্র, (২) মানুষের প্রতিকৃতি এবং (৩) জীবজন্তুর ছবি।

প্রাকৃতিক দৃশ্য

রবীন্দ্রনাথ গাছপালা, লতাপাতা, ফুল ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র অনেকগুলি এঁকেছেন। এ সবগুলিকে এক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যেতে পারে। এগুলির মূল্য প্রধানত আলঙ্কারিক। প্রকৃতির নিখুঁত অনুকরণের চেষ্টার বালাই মাত্র নেই—শুধু একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সৃষ্টি কিংবা বিভিন্ন রঙের সমাবেশে আলোছায়ার খেলা। বহু প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গাছপালার ছবি তিনি কালি-কলম দিয়ে শুধু রেখার সমাবেশে গড়ে তুলেছেন। 'সে' বইয়ের ১০৬ পৃষ্ঠার ছবিখানি এ বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অসংখ্য অপূর্ব ভঙ্গির অতি সূক্ষ্ম লীলায়িত রেখার জালের ভিতর দিয়ে যে বৃক্ষরাজির আভাস সুকুমার ভঙ্গিমায় জেগে উঠেছে, তার তুলনা নেই। এই বইয়ের ২৩ ও ৬৯ পৃষ্ঠার চিত্র এবং "খাপছাড়া"র প্রথম ও ১৯ পৃষ্ঠার ছবি—এগুলিও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

এ সম্বন্ধে প্রতিমা দেবী লিখেছেন: "অনেক সময় দৃশ্য আঁকতে গিয়ে কেবল কতকগুলি রঙের পোঁচ কেন লাগানো হয়েছে, এ প্রশ্ন মনে উঠতে পারে। প্রাকৃতিক চিত্রে তিনি রেখা ও পার্স্পেকটিভ-এর নিয়ম মেনে চলেননি; বিচিত্র আলোছায়াকে হরেক রকম রঙে ফলিয়েছেন। তাঁর ছবিগুলি আলোছায়ার সমন্বয়ে গঠিত সাদা-কালোর বিরহ-মিলনের খেলা। আলোর গ্রহণ ও বর্জনেই রঙের উৎপত্তি। অনন্ত আকাশ-পথে যে আলো বিচরণ করছে, তারই পদক্ষেপের চঞ্চল ভঙ্গির বিচিত্র রঙিন•

ছায়া জগতে প্রতিফলিত হচ্ছে। শিল্পীর মনে লেগেছিল সেই আলোক-মায়া। তাঁর সমগ্র চিত্রকলা সেই কিরণরশ্মির ছন্দোলীলা।......বিশ্বসৃষ্টির এই ললিতকলা এ'কে তাঁর মন তৃপ্ত হয়নি, ভালো-মন্দ-সুখ-দুঃখপূর্ণ জগৎটাকে কেতাবের পাতার মতো খুলে ধরেছেন চোখের সামনে। মনোজগৎ ও বাস্তব জগতের বিচিত্র রূপ চন্দ্র-সূর্য গ্রহনক্ষত্রের মতোই বেরিয়ে এসেছে তাঁর অন্ধকার মানস গুহা থেকে, সৃষ্টির বিচ্ছুরিত গতির খণ্ড খণ্ড উল্কার মতো; কোনোটা স্বপ্নময় ইন্দ্রজাল, আর কোনোটি বা তাণ্ডবের স্খলিত চরণের দুর্দমনীয় বেগের উদ্দাম প্রগল্‌ভ মূর্তি। এই সব অজ্ঞাত চেতন-লোকের অহেতুক রূপকে মানুষ কী সংজ্ঞাই বা দিতে পারে? এই রূপলোক হোল অনন্ত সাগরের লীলায়িত তরঙ্গের সসীম আকৃতি। এগুলি এক দিকে যেমন ব্যক্তিগত, আর একদিকে তেমনি বিশ্বজনীন। তাঁর দৃষ্টির বাতায়ন-পথে যে অসীম দীপ্তির ছায়া পড়ত, তার থেকেই উদ্ভূত হোত তাঁর চিত্রকলা। তিনি আলোর গতি-পূর্ণ বর্ণগুলিকে ধরেছেন তাঁর রঙের খেলায়। এগুলি তাঁর অনন্ত শিশুচিত্তের খেলনা,—পৃথিবীতে যারা অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার আভাস রেখে গেছে।"

মানুষের প্রতিকৃতি

রবীন্দ্রনাথ মোট প্রায় আড়াই হাজার ছবি এ'কেছেন। তার মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগই মানুষের ছবি। এই ছবিগুলিকে আবার মোটামুটি ৭।৮ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—(১) বাস্তব চিত্র, (২) ভীষণ মূর্তি, (৩) আলঙ্কারিক অঙ্গাবয়র, (৪) জ্যামিতিক আকারের অনুকরণে অঙ্কিত মূর্তি, (৫) পোর্ট্রেট বা মানুষের প্রতিকৃতি, (৬) মুখোস, (৭) নিজের প্রতিকৃতি, (৮) নাটকীয় (dramatic) মূর্তি ইত্যাদি। এর মধ্যে পোর্ট্রেট ধরনের যে সব ছবি তিনি এ'কেছেন, তার মধ্যে কতকগুলিকে এক-একটা টাইপের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ একই টাইপ বিভিন্ন ছবিতে বার বার দেখা দিয়েছে। কতকগুলি ছবিতে আবার দেখা যায় একই চোখের গড়ন—একই চোখের ভঙ্গি। এর কারণটা যে কি, সে সম্বন্ধে নন্দবাবু রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"নতুন বৌঠানের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী) চোখ দুটো এমন ভাবে আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে যে মানুষের ছবি আঁকতে বসলে অনেক সময়েই তাঁর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে—কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তাই ছবিতেও বোধ হয় তাঁর চোখেরই আদল এসে যায়।"

'সে' ও 'খাপছাড়া'—এই বই দু'খানার অধিকাংশ চিত্রই মানুষের চেহারার ছবি। মানুষকে তিনি যে কত রূপে, কত ভাবে, কত দিক থেকে দেখেছেন, তার পরিচয় এই ছবিগুলিতে। আমাদেরও জীবনে কত মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু যখন এক-একটি মানুষকে স্মরণ করবার চেষ্টা করি, তখন কোনো মানুষেরই সম্পূর্ণ ছবিটি আমাদের মনে ভেসে ওঠে না—কারো হয়তো মুখের খানিকটা, কারো চোখের একটা বিশিষ্ট চাহনি, কারো ললাটসুদ্ধ ভ্রূর টানটি, কারো সামনের দিকের, কারো বা এক পাশের ছবি, কারো গাম্ভীর্য, কারো দৃঢ়তা, কারো ক্রূরতা, কারো কুৎসিত বীভৎস মুখভাব, কারো বা চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের অন্য কোনো বিশেষত্ব। স্মৃতির এই বিচিত্র হেলাফেলার খেলাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে রূপ দিয়েছেন। কোথাও বড়ো তিনি সম্পূর্ণ মানুষটিকে আঁকেননি, কিংবা প্রকৃত মানুষের মাপজোখের সঙ্গেও বিশেষ কোনো মিল রক্ষা করেননি। তিনি শুধু মানুষের কোনো অঙ্গবিশেষের রূপ কিংবা কোনো একটা ভাবের আভাস মাত্রই ফুটিয়েছেন। যখনই তাঁর মনে হয়েছে যে, 'ছবি একটা কথা বলছে', তখনই তিনি আঁকা শেষ করে দিয়েছেন—তাতে আর হাত দেননি। তাই তাঁর ছবির কোনোটি মহত্ত্বগৌরব-মণ্ডিত শুধু একটি মুখমণ্ডল, কোনো ছবিতে শুধু মুখের হাসি-হাসি ভাব, কোনোটিতে রহস্যপূর্ণ অনুসন্ধিৎসু মুখভাব, কোনোটিতে চোখের বক্র-কুটিল চাহনি, কোনোটিতে কুৎসিত বিকৃত মুখভঙ্গি, কোনোটিতে শিশুর সুকুমারত্ব, কোনোটিতে নারীর কমনীয় মুখের পেলবত্ব।

এ সম্বন্ধে প্রতিমা দেবী লিখেছেন : ''এদের দিকে তাকালে মনে হয় যেন কত জানা লোকের মুখের ছায়া দেখতে পাই, হঠাৎ যেন বহুকালের বিস্মৃত মানুষের চেহারা ও চরিত্রগুলো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এই সব মুখগুলির মধ্যে যেন তাদের সত্তার গভীর সংঘাত ফুটে বেরিয়েছে। তারা যেন মনোজগতের এক একটি নীহারিকা। যে-সব মানসিক গতি নিজের কাছেও অজানা, অথচ অবচেতন চিত্তলোকে যা কখনো ভেসে উঠছে, কখনো বা মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই সব কল্পনাপ্রবণ মনের রহস্যপূর্ণ বিশেষত্ব ছবির মুখের রেখাতে যেন জীবন্ত রূপ নিয়েছে। তারা আঙ্গিকের বাঁধাধরা নিয়ম মানেনি বলেই তাদের প্রকাশভঙ্গি এত জোরালো এবং গতি এত অবাধ। সাধারণত আর্টিস্টরা যে-সব ভাবভঙ্গিকে আর্টের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং তাদের প্রকাশভঙ্গিতে যে সনাতনীয় ছাপ থাকে, গুরুদেবের চিত্রকলা সেই সাধারণ পথ এড়িয়ে নতুন পথ নিয়েছে।"—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জীবজন্তুর ছবি

পশুপক্ষী জন্তু-জানোয়ারের যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন, তাও সত্যিকার পশুপক্ষী জন্তু-জানোয়ারের বাস্তব ছবি নয়—রূপের আভাস মাত্র ফুটিয়ে তোলাই তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন। এগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) বাস্তব, (২) আলঙ্কারিক এবং (৩) অদ্ভুত। এর মধ্যে অদ্ভুত পর্যায়ের ছবিগুলি সবিশেষ বিশেষত্বপূর্ণ। এ ছবিগুলিতে নিছক রূপের ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে,—এ ছাড়া এ সবের অন্য কোনো অর্থ নেই। এর মধ্যে কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। বাকীগুলি তাঁর খামখেয়ালী মনের সৃষ্টি—যেমন-খুশি কলম চালিয়ে তিনি যেমন-খুশি আকৃতি গড়ে তুলেছেন—তেমন আকৃতি হয়তো প্রকৃতির রাজ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সব অদ্ভুত-দর্শন কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর ছবি তাঁর অহেতুক আনন্দের কৌতুককর খেলা—তাঁর অফুরন্ত সৃষ্টিপ্রতিভার খামখেয়ালী সৃষ্টি।

এ সম্বন্ধে প্রতিমা দেবী লিখেছেন: "তাঁর নানাপ্রকার প্রাণীর চেহারাগুলি সবই বাস্তব জীব-জন্তুর থেকে তফাত। কারণ শিল্পীর চোখ এই সব জীবের দেহের চেহারাকে এড়িয়ে ভাবের আকৃতিকেই দেখতে পেত। এমনি করেই তাঁর বাঘের ছবিতে ফুটে উঠত হিংসার লোলুপতা। আসলে বাঘের দৈহিক ভঙ্গিকে অবলম্বন করে হিংসা ও লোভের গ্রাসকেই তিনি আঁকতেন। তাই বাস্তবিক বাঘের চেহারার সঙ্গে তার মিল না থাকলেও, ছবির রেখায় বাঘের চরিত্রের দাগ মুদ্রিত হোল। তাঁর আঁকা মস্ত বড়ো একটা মহিষের মতো জন্তুর আকৃতির মধ্যে প্রকৃতির একটা আদিম শক্তির চেহারা যেন বেরিয়ে আসে, যাকে ম্যাডাম ড্য নোয়াই বলেছেন—'ক্ষুধিত মোহ-গ্রস্ত অভিশপ্ত জীব।' সেটাকে নাম দিতে গেলে হয়তো বলব, হিপোপটেমাস বা আর কিছু; কিন্তু এটি তাঁর নিজের তৈরি জিনিস। প্রকৃতির গড়া জিনিস এখানে শিল্পী নকল করেননি, তিনি করেছেন মনের মতো করে সৃষ্টি।"—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি

নিজের ছবি আঁকা ও ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে নিজেই যা বলেছেন, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দেওয়া যাচ্ছে:

"ছবিতে আমার একটা বেশ মজা আছে। আমি তো ছবিতে একই বারে রং দিই না। আগে পেনসিল দিয়ে ঘসে ঘষে একটা রং তৈরি করি মানানসই করে, তারপরে তার উপরে রং চাপাই। তাতে করে হয় কি—রংটা বেশ একটু জোরালো হয়।"

"আমার হচ্ছে—যা ইচ্ছে তাই। কাগজ রং নিয়ে যা মনে হোল, তাই আঁকলুম, মনের সঙ্গে রং তুলি নিয়ে খেলা খেললুম। সেই হচ্ছে আমার ছবি।—"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ", ১১-৭-৩৯

"আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে—'বেশ সুন্দর হয়েছে', তখনি আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি। এমনি করে তার একটা রূপ বের হয়। আমি মানুষের জীবনটাও এমনি করেই দেখি। মানুষ যখন একবার ঘা খায় বা পড়ে যায়—একটা কিছু সাংঘাতিক ঘটে, তারপরে মানুষ যখন নিজেকে ফিরে তৈরি করে, তখনি তার একটা সত্যিকার রূপ হয়।" —"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ", ১১-৭-৩৯

"পেনসিলগুলো আমার পটপট করে ভেঙ্গে যায়। অবশ্যি আমি একটু চাপ দিয়েই আঁকি।—মনটা জোরে চলতে থাকে কিনা।" (১৩-৭-৩৯)

"আমি যা আঁকি, তা মনের অগোচরে। ইচ্ছা করে' আঁকা বা আঁকতে চাওয়া, তার একটা রূপ দেওয়া—তা আমার দ্বারা হয় না। হিজিবিজি কাটতে কাটতে একটা কিছু রূপ নিয়ে যায় আমার আঁকা। একে কি আর্টিস্ট বলে। তোমরা আমায় স্তুতিবাক্যে ভোলাও। দেখো না কতগুলো মাথামুণ্ডই আঁকলুম। কোনোটার গোঁফ আছে, কোনোটার নেই, কোনোটা বেঁকে আছে, কোনোটা অদ্ভুত—এর কি কোনো মানে আছে?"—"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ", ২৪-৭-৩৯

"দেখ তো অন্ধের মতো বসে বসে এই ছবিখানি করলুম। শুধু লাইনেই রেখে দিলুম। এইতেই যখন ছবি একটা কথা বলছে, তখন আর তাতে কিছু করা উচিত নয়। নয়তো আমার স্বভাবই হচ্ছে, ছবিকে নষ্ট করে, তারপরে তাকে উদ্ধার করা। বেশ মজা পাই আমি তাতে। এই ছবিখানাতে বেশ একটু চিন্তার ভাব এসেছে—না? আমার সব ছবিই এই রকম। হাসি-খুশি ভাব হয় না কেন, বলতে পারিস্? অথচ আমি নিজে হাসতে ও হাসাতে ভালবাসি, কিন্তু আমার সব ছবিরই ভাব কেমন বিষাদ, মাখা। হয়তো ভিতরে ভিতরে আছে আমার ও-টা।" (৩১-৭-৩৯)

"ছবি আঁকার সব সাজ-সরঞ্জাম হাতের কাছে না থাকলে আমার ছবি আঁকা হয় না। একটু তুলি, একটু কলম, কালি, রঙ সব মিশিয়ে বড়ো কাগজে ছবি আঁকতে

রঙ প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে, তার পরে ছবি আঁকতে বসেন না। একটা কলম হাতে পেলেই তাঁর হোল। প্রধানত কলম দিয়েই তিনি ছবি আঁকেন —নিজের মনের ভাবটাকে রূপ দেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্র জটিলতাহীন, সাদাসিধে, কিন্তু প্রাণবন্ত, সতেজ। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে পৃথিবীর সুবিখ্যাত চিত্রকরদের সংস্পর্শে এসে এবং চিত্রাঙ্কনের যাবতীয় আঙ্গিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই চিত্রাঙ্কনের আঙ্গিকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি যে সব ছবি এঁকেছেন, তার মূলে রয়েছে এত দিনকার এই অভিজ্ঞতা। আমরা যদি সযত্নে ও সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর চিত্র-কলার বিচার করি, তবে তাঁর ছবির সদ্‌গুণ ও তাৎপর্য নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবো। ইতিমধ্যেই তাঁর চিত্রাবলি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। জার্মানী, আমেরিকা, ফ্রান্স্‌ এবং অন্যান্য দেশে তাঁর ছবি খুব উচ্চ মূল্যেই বিক্রীত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের কোনো কোনো ব্যক্তি-বিশেষ ও বিভিন্ন যাদুঘর তাঁর ছবি সংগ্রহ করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে এবং এক-একটা ছবির জন্যে ... থেকে ৭০০ ডলার মূল্য দিয়েছে।

...৯৩০ সালে ইংলণ্ডের বারমিংহাম সিটি-আর্ট-গ্যালারীতে রবীন্দ্রনাথের ছবির ...র্শনী হয়েছিল, তা দেখে সেই সময়ে ইংলণ্ডের বহু গুণগ্রাহী কলা-রসিক ...র ছবির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তার মধ্য থেকে ২।১ জনের অভিমত ...ত করে দিচ্ছি:

"...ater on we come to a very interesting development, that in ...sign is a deliberate aberration from natural forms, approaching ...nces the deliberately grotesque. There is an immense amount ...ent in this group of drawings, * * * * In one or two instances ...exquisite handling of line and form in which human figures ...ir beauty and their value as a design, not from direct resemblance ... figures, but rather from the quality of the line by which those ... expressed.

... are seen at their best when the line is extremely fine, and very ... enhanced by no colour whatever, and the range of artistic ... very strongly emphasized when we come to the designs which ...y for their visual satisfaction on the colour.

Some of these latter are of astounding power, their very deep tones and wonderfully harmonious sequence produce exactly the same effect of rhythm as that which is to be observed in purely linear work, and we might sum up the whole of this exhibition as being a marvellous example of the sense of balance and of harmony, even in the most fortuitous of its forms."—Mr. Kaines-Smith, in the *Birmingham Mail*

(2) "Tagore's drawings constrain us to pause and ask ourselves anew, what is the purpose of drawing, of painting, of art generally. Is it to be a pretty toy to amuse and flatter us, or is it to convey the deepest feelings from soul to soul?

The popular artist, like the popular preacher, is careful never to offend our prejudices, or to call us to make any great mental or spiritual effort, while the true Poet or painter asks us to see what we have not yet seen.

The drawings of Rabindranath Tagore prove that the poet, though a master of the use of words, feels that certain things can be better expressed, or perhaps only expressed in the language of line, tone and colour.

These things are not outward facts such as those of anatomy and perspective, and the rules that can be taught in Academies which become too often a hindrance to the freedom and vitality of imagination. Tagore's drawings are, as I see them, the work of a powerful imagination seeing things in line and colour as the best Oriental sees them, with that sense of rhythm and pattern that we find in Persian or Indian textile and craft work. The colour sense is indeed superb.

But there is much more than this; there is a deep feeling and apprehension of the spiritual life and being, of men and animals, expressed in their features, their movements, their outward forms, lines and colours.

Can one explain all this in words? Can one say this drawing means this or that one means such and such? Assuredly no, for if any one could say it, the poet himself could do so, and if he could say it, then why draw or colour? We look and look silently, and immerse ourselves in these

pictures, and thus here and there if we are humble enough, deep answers unto deep."—Joseph Southall, Birmingham

(১) রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে এক পর্যায়ের ছবি দেখি, যাতে তিনি প্রাকৃতিক রূপ ছাড়িয়ে অপ্রাকৃত বা অতি-প্রাকৃত রূপের সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে কতকগুলি একেবারেই কিম্ভূতকিমাকার! এই পর্যায়ের ছবিগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক—প্রচুর আনন্দ উপভোগের উপকরণ এতে আছে।...রেখা ও রেখার সাহায্যে রূপ অঙ্কনের হাত তাঁর অতি চমৎকার। দু একটি ছবিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিতে মানুষের চিত্র আঁকা হয়েছে। কিন্তু মানুষের সত্যিকার চেহারার সঙ্গে মিল থাক বা না থাক, রেখা অঙ্কনের বাহাদুরীই এ ছবিগুলির বিশেষত্ব।

যে ছবিগুলিতে রেখা-রাজি অতিশয় সূক্ষ্ম ও রঙের ছোঁয়াচহীন এবং ভাবাদর্শের কথা বাদ দিয়ে ছন্দশীল রূপ সৃষ্টিই যার প্রধান উদ্দেশ্য, সেগুলিতে এই বিশেষত্ব বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। আর, শিল্পীর কলা-জ্ঞান ও অনুভূতির বিপুলতায় আমরা অবাক হয়ে যাই, যখন আমরা সেই ছবিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যেগুলি শুধু রঙের অপূর্ব সমাবেশের জন্যেই দর্শকদের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ।

এই শেষোক্ত পর্যায়ের ছবিগুলির মধ্যে কতকগুলি আশ্চর্য রকমের তেজ-ব্যঞ্জক। তাদের গাঢ় রঙের প্রলেপ এবং বিস্ময়কর সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতি এমন একটা পরিপাটি ছন্দোময়তার ভাব জাগায়, যা শুধু রেখায় অঙ্কিত চিত্রের পক্ষেই সম্ভবপর। রবীন্দ্রনাথের এই চিত্র-প্রদর্শনী দেখে মোটামুটি এই কথা বলা যায় যে তাঁর চিত্রাবলি সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্য বোধের চমৎকার উদাহরণ।—মিস্টার কেইন্ স্মিথ্, "বারমিংহাম মেইল"

(২) রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে আমাদের মনে নূতন করে এই প্রশ্ন জাগে যে, রেখাঙ্কন, চিত্রাঙ্কন—তথা সাধারণভাবে কলা-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? তা কি আমাদের মনোবিনোদনের জন্যে সুদৃশ্য খেলনা সৃষ্টি করা, না একের অন্তরের গভীরতম অনুভূতি অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করা?

লোকপ্রিয় ধর্মবক্তার মতোই লোকপ্রিয় শিল্পী সর্বদা সাবধানে থাকে, যাতে তারা সাধারণের অন্ধ-সংস্কারে কোনো আঘাত না দেয় কিংবা এমন কিছু না বলে বা না আঁকে, যার অর্থ বুঝতে যথেষ্ট মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু সত্যিকার কবি বা শিল্পী যিনি, তিনি আমাদিগকে এমন কিছু দেখিয়ে দেন, যা আমরা পূর্বে কখনো দেখিনি।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি প্রমাণ করে যে, কবি যদিও শব্দের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত,

তথাপি সময় সময় অনুভব করেন যে, এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যা রেখা ও রঙের ভাষায়ই ভাল ভাবে প্রকাশিত হ'তে পারে, কিংবা এই ভাবেই শুধু প্রকাশ করা সম্ভবপর।

এসব কোনো বাহ্য ব্যাপার নয়। দেহের অস্থি-সংস্থান, চিত্রে পরিপার্শ্বিকের বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার কাজ কিংবা চিত্র-বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় নিয়ম-কানুন, যা অনেক সময়ে কল্পনার প্রাণ-শক্তি ও স্বাধীনতার পরিপোষক না হয়ে বাধারই সৃষ্টি করে, তার মতো বাইরের ব্যাপার এসব নয়। আমার দৃষ্টিতে টাগোরের আঁকা ছবি খুব শক্তিশালী কল্পনার সৃষ্টি। প্রাচ্য দেশের মনীষীরা যে দৃষ্টিতে বস্তু-নিচয় রেখা ও রঙে গঠিত দেখেন, তাঁদের সেই দৃষ্টির বিশেষত্বের পরিচয় এতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ বা পারস্যের বস্ত্র-শিল্পে ও হস্ত-শিল্পে যে রকমারি নক্সা ও ছন্দশীলতা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের চিত্রেও তা-ই দেখা যায়। আর রঙের বোধ সত্যই অতি চমৎকার।

এ সবের চাইতেও অনেক বেশি এতে আছে। মানুষ ও পশুর জীবনের গভীরতর দিকের বিপুল জ্ঞান ও নিগূঢ় অনুভূতির পরিচয় আমরা পাই, তিনি যে মানুষ ও পশুর চিত্র এঁকেছেন, তাদের চেহারা, চলা-ফেরা, বহিরাকৃতি, সীমা-রেখা ও বর্ণের বৈশিষ্ট্যে।

এই সব বিশেষত্ব কি ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর? কেউ কি বলতে পারে যে, এই ছবিখানার অর্থ এই, কিংবা অপর একখানা ছবির অর্থ অন্য কিছু? নিশ্চয়ই না। কেননা, যদি কেউ বলতে পারে, তবে কবি নিজেই তা পারতেন এবং তিনি যদি তা পারতেন, তবে রঙ ও রেখার সাহায্য তিনি নিতে যাবেন কেন? আমরা নির্বাক হয়ে ছবির পানে চেয়ে থাকি—দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে যাই এবং আমাদের মনে গভীর বার্তা গ্রহণ করতে পারার মতো বিনয় ও সৌজন্য যদি থাকে, তবে কখনো কখনো হয়তো অন্তরাত্মা অন্তরাত্মার সঙ্গে কথা কইবে।—জোসেফ সাউদল, বারমিংহাম

১৯৩০ খৃস্টাব্দে জার্মানীর ম্যয়েলার গ্যালারীতে (Galerie Moeller) রবীন্দ্র-চিত্রাবলির যে প্রদর্শনী হয়েছিল, তার পরে জার্মানীর বহু পত্রিকাদিতে রবীন্দ্রনাথের ছবির বহু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো কোনো পত্রিকায় একাধিকবার আলোচনা হয়েছিল। যে পত্রিকাগুলিতে আলোচনা বেরিয়েছিল, তার কয়েকটির নাম: ম্যয়েনশেনার টেলিগ্রাম ৎসাইটুং, ম্যয়েনশেন (২৩-৭-৩০), হামবুরগার ফ্রেমডেন ব্লাট্ (২৬-৭-৩০), ভসিশে ৎসাইটুং, বার্লিন (১৬-৭-৩০), বার্লিনার ব্যয়েরজন্ ৎসাইটুং, বার্লিন, মান্‌হাইমার্ টাগেব্লাট্ (২২-৭-৩০), হানোভা-

রিশার্ কুরিয়ার (১৯-৭-৩০), নাৎসনাল টিডেন্ডে (৭-৪-৩০) ইত্যাদি। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি পত্রিকার লেখা খানিকটা করে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

(1) The abundance of subjects and not less the multiplicity of the technical experiments are surprising. The dominating black ink lines divide the coloured washes of colour, which in most cases themselves form decorative patterns. Then the Oriental, the Indian mystic, breaks through —with his fantastic birds and strange animals of legend finely cut in arabesques and the masks representing in manifold form the human face. A note of calm and quiet runs through all these strange creations. The figure of a dancer in blue shadings is on a very high intellectual level, and the large head of a woman drawn in large oval spirals in violet tones, suggests a fine silk.—*Muenchener Telegram-Zeitung,* Muenchen (23-7-30)

(2) New visions were seized in his pictures that descend to the depths, to the origin, of which the reality of the world is only a feeble copy, a reflected light. Animals play a great part in them, but not those from the Zoo, but those who alarm us in black nightmares. The way Tagore coloured these monkeys, tigers, vultures and other marauders, displays the educated sensitive taste of oldest culture. Reddish, brownish, yellowish tones that are full of coloured life, often contrast with the black background, that plays an important part—it is the night of dream. We meet with dark harmonies of deep mystery, from where the objects often emerge with light outlines.

Most remarkable is how this way of Tagore's to look behind the objects of this world meets with European and especially with German artists of our days. Some of the animals might be illustrations of Christian Morgenstern. There occur special allusions of human figures that remind us of Munch. There are groups and heads that let us think of Nolde—the head of an Indian in black and white looks like one of his early wood-cuts. Free play of humour reminds us of Paul Klee. Sometimes we find a very delicately executed joke in an ornamental style, for instance where the

birds pay homage to the flying man. Again we perceive how the intellectual movements of the time go around the earth, again we see how necessary it was for the revival of imagination to descend to the depth from where life comes, so as to get rid of the awful routine of the illusional realism.—*Vossische Zeitung,* Berlin (16-7-30)

(3) Tagore has brought with him a surprise this time. He paints. He has 300 pictures on exhibition. Pictures of nature, of animals, flowers and birds. Decoratively formal homage of birds paid to the men who have wings. Strange animals of legend, rare birds, angular (jagged) forms. Madonnas set in shining backgrounds. Dreamy formalism. Signs of Nolde, Kleen and Kubin are everywhere apparent. All is full of rhythm and inner melody. Tagore shows an amazing taste in colour.—*Mannheimer Tageblatt* (22-7-30)

(১) বিষয়-বস্তু এবং চিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিকে পরীক্ষার প্রাচুর্য দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। রঙ দিয়ে আঁকা অংশকে কালো কালির মোটা মোটা সুস্পষ্ট রেখা টেনে পৃথক করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবটা একটা আলঙ্কারিক নক্‌সা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরে, প্রাচ্য তথা ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানীর হঠাৎ অভ্যুদয় এবং সেই সঙ্গে তার আপন মনের কল্পনা প্রসূত অদ্ভুত পাখি, প্রাচীন গল্পে উল্লেখিত অদৃষ্টপূর্ব বিচিত্র জন্তু-জানোয়ার এবং বহু প্রকারের মনুষ্য-মুখের আদর্শে আঁকা মুখোসের নক্‌সা। এই সব অদ্ভুত সৃষ্টিতেও একটা শান্ত-সমাহিত ভাব সুস্পষ্ট। ফিকে নীল রঙে আঁকা এক নর্তকীর চিত্র খুব উঁচু দরের ধীশক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নেই এবং নীল-লোহিত রঙে আঁকা এক মহিলার বিরাট অণ্ডাকৃতি একটা মাথা সূক্ষ্ম রেশমের তৈরি বলে প্রতীতি জন্মে।—"ম্যুয়েনশেনার টেলিগ্রাম ৎসাইটুং", ম্যুয়েনশেন (২৩-৭-৩০)

(২) রবীন্দ্রনাথের চিত্রে এক অজ্ঞাতপূর্ব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সে দৃষ্টি বস্তুর গভীরে—বস্তুর সৃষ্টির মূলে গিয়ে পেঁৗছায়, পৃথিবীর বাস্তব বস্তুরাজি যার অক্ষম অনুকরণ বা তা থেকে প্রতিফলিত আলোর আভাস মাত্র। তাঁর চিত্রাবলিতে জন্তু-জানোয়ারের ভূমিকা অনেকখানি। সে সব চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ার নয়—যাদের [illegible]

বানর, বাঘ, শকুন-শকুনী ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চিত্রে যে ভাবে রঙের ব্যবহার

করেছেন, তাতে প্রাচীনতম সংস্কৃতির শিক্ষিত সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় ধরা পড়ে। কালো পট-ভূমির উপরে রক্তাভ, পিঙ্গলাভ ও পীতাভ রঙে তুলির টান টেনে বৈসাদৃশ্যের মনোহারিত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সব ছবিতে রঙ-ব্যবহারের নৈপুণ্যে পরিপূর্ণ-রূপে জীবনের রঙ প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্র-কলায় এই ভাবের রচনা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ সব যেন স্বপ্নের নৈশ-জগৎ। সেখানে আমরা সাক্ষাৎকার লাভ করি গভীর রহস্যাবলির একটা নিগূঢ় সমন্বয়, যেখানে বস্তু-নিচয় আলোর রেখায় গঠিত বলে' প্রতীতি জন্মে।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পার্থিব পদার্থ-রাজির বহিরাবরণের অভ্যন্তরে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের সমসাময়িক ইউরোপীয়—বিশেষ করে জার্মান শিল্পীদের যে একটা মিল দেখা যায়, তা কেমন করে সম্ভবপর হোল? রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত কতকগুলি জন্তু-জানোয়ারের চিত্র মর্গেন্স্ট্যার্ন্ এর আঁকা চিত্রাবলির দৃষ্টান্ত হিসাবে অনায়াসে ধরা যেতে পারে। মানুষের আকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কতকগুলি ছবি আমাদিগকে মুন্চ্ এর ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। কতকগুলি মনুষ্য-মস্তকের চিত্র এবং আর কতকগুলি একসঙ্গে বহু মানুষের ছবি আছে—সেগুলিকে নল্ডে এর আঁকা বলে মনে হয়। কালো-সাদায় আঁকা কোনো এক ভারতীয়ের মস্তক নল্ডে এর প্রথম দিককার কাষ্ঠে খোদিত ব্লকের ছবি বলে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁর রসিকতার অসঙ্কোচ প্রয়োগ দেখে পাউল্ ক্লের কথা স্বতই আমাদের মনে উদয় হয়। আলঙ্কারিক রীতিতে আঁকা কোনো ছবিতে সূক্ষ্ম রসিকতা খুব চমৎকার ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই ছবি-খানার উল্লেখ করা যায়, যে খানায় পাখিরা মাথা নীচু করে উড়ন্ত মানুষকে প্রণতি জানাচ্ছে। এই সব দেখে আমরা আবার নূতন করে বুঝতে পারি, সমসাময়িক মানসিক চিন্তার ধারা কেমন করে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে—নূতন করে আমরা জানতে পারি যে, বিভ্রান্তকারী বাস্তবতার ভয়াবহ গতানুগতিকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন কল্পনার পুনরুদ্বোধনের জন্যে প্রাণের প্রথম উন্মেষ যেখানে, সেই গভীরে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি!—ভসিশে ৎসাইটুং, বার্লিন (১৩-৭-৩০)

(৩) টাগোর এবার এখানে এসেছেন এক বিস্ময় সঙ্গে নিয়ে। তিনি ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা ৩০০ খানা ছবি নিয়ে চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য, জন্তু-জানোয়ার, ফুল, পাখি প্রভৃতির ছবি। ডানা-বিশিষ্ট উড়ন্ত মানুষকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পাখিদের প্রণতি আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে চিত্রিত হয়েছে।

প্রাচীন গল্পে উল্লেখিত অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ার, দুর্লভ পাখি, কোণ বিশিষ্ট আকৃতি—এই সব তিনি এঁকেছেন। কল্পলোকের অহেতুক রূপ-সৃষ্টি! নলডে; ক্লে এবং কুবিনের সঙ্গে সাদৃশ্য সর্বত্র সুস্পষ্ট। সবই পরিপূর্ণরূপে ছন্দশীল এবং আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের মাধুর্যে পূর্ণ। টাগোর রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা ও যে বর্ণ-বোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়াবহ!—মান্‌হাইমার টাগেব্লাট (২২-৭-৩০)

১৯৩০ খৃস্টাব্দে ফরাসী দেশের গ্যালারী পিগেল্‌এ রবীন্দ্র-চিত্রকলার যে প্রদর্শনী হয়েছিল, সেই উপলক্ষে ফরাসী দেশে রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সেই সময়ে মঁসিয়ে হেনরী বিদু নামক একজন চিত্র-সমালোচক খবরের কাগজে একটা দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন। তা থেকে সামান্য একটু উদ্ধৃত করা গেল :

This work is not a hobby or a plaything. For the last two years, Rabindranath Tagore has been wholly occupied by this new form of creation. The drawings which he produces with pens and inks, and which have the appearance of singularly skilful and sumptuous water-colours, take possession of him, and once begun, leave him no peace, until they are finished. They are done at a sitting, and in a very short time, scarcely more than an hour, without a single mistake of the pen, as it threads the maze of intersecting curves and blank spaces. This new vocation is not so mysterious after all.

A latent genius was asleep ; that is made plain by the sureness of the design, the beauty of the tones, the liveliness of every detail, the sense of ornament. For almost a life-time, this genius has been kept in the shadows, for the highly developed faculties of the conscious mind left no room for the expression of this hidden force. One fine day it revealed itself, and the poet felt that another person was being manifested in him, but the new minister has not changed the laws of the state.

রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টি-প্রয়াস ক্ষণিকের খেলা বা সখ মেটানো নয়। গত দুই বৎসর ধরে এই প্রকার সৃষ্টির কাজে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত রেখে-ছিলেন। তাঁর কালি-কলম দিয়ে আঁকা ছবিগুলি দেখে সেগুলিকে অসামান্য দক্ষতায়

সঙ্গে আঁকা জমকালো জল-রঙের ছবি বলে ধারণা জন্মে। এগুলি আঁকবার সময়ে তিনি এতটা তন্ময় হয়ে যেতেন যে অন্যেরা মনে করতো, তাঁকে যেন কিসে পেয়ে বসেছে এবং একবার একাজ আরম্ভ করলে, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মনে শান্তি থাকতো না। এই সব ছবি তিনি একাসনে বসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করতেন—ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় কোনো ছবিতেই বড় লাগেনি। এগুলি আঁকতে তিনি কলম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বক্র রেখার উপর দিয়ে বার বার বক্র রেখা টেনে খালি জায়গা ভরিয়ে দিয়ে যে গোলক-ধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছেন, তার ভিতরে কোথাও কলমের টানের কিছুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। মোট কথা, কবির এই নূতন বৃত্তি এমন কোনো রহস্যাবৃত দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়।

তাঁর ভিতর গুপ্ত প্রতিভা সুপ্ত ছিল। তাঁর নির্ভুল নক্সা আঁকা, পরিমাণ মতো রঙের পোঁচে সৌন্দর্য-সৃষ্টির দক্ষতা, লাবণ্য যোজনার বোধ, এবং চিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়েও সজীবতা ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা—এ সবই এ কথার প্রমাণ। প্রায় সমস্তটা জীবন ধরেই এই প্রতিভা তাঁর ভিতরে চাপা পড়ে ছিল—স্ফুরণ হতে পারেনি। সজ্ঞান মনের পূর্ণ বিকশিত প্রবল বৃত্তি-সমূহের চাপে এই গুপ্ত শক্তি প্রকাশের পথ পায়নি। হঠাৎ একদিন এই শক্তি আত্মপ্রকাশ করে বসলো এবং কবি তাঁর নিজের মধ্যে এক নূতন ব্যক্তির আবির্ভাব অনুভব করলেন। কিন্তু এই নূতন মন্ত্রী রাষ্ট্রের আইন-কানুন পরিবর্তন করা বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করলেন না।

উপসংহার

আরম্ভেই বলেছি, একটা কথা আছে যে, "Great art is an unconscious creation"। উঁচু দরের কলাসৃষ্টি সম্পূর্ণ অপ্রবুদ্ধ সৃষ্টি,—স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, অনবহিত। স্রষ্টা সৃষ্টি-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপন মনের আনন্দে সৃষ্টি করে যান—সে সৃষ্টি কত বড়ো দরের সৃষ্টি, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো খেয়ালই থাকে না। কিন্তু রসজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখে বলেন : 'এমনটি আর হয় না—অতুলনীয়, অনন্যসাধারণ'। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও যে এ নিয়মের ব্যত্যয় হয়নি—তাঁর সৃষ্টিও যে যেমন উঁচু দরের, তেমনি অপ্রবুদ্ধ সৃষ্টি, সজ্ঞান সৃষ্টি নয়, এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে বলবার চেষ্টা করেছি। যদি কৃতকার্য না হয়ে থাকি, তবে তা রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের অভাববশত নয়—তার জন্য দায়ী আমারই ত্রুটি, আমারই অক্ষমতা।
